অতুলচন্দ্র গুপ্ত -প্রণীত

কাব্যজিজ্ঞাসা

নদীপথে

জমির মালিক

শিক্ষা ও সভ্যতা

সমাজ ও বিবাহ

ইতিহাসের মুক্তি

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

এ বইয়ের প্রথম দুটি প্রবন্ধ— 'ইতিহাসের মুক্তি' ও 'ইতিহাসের রীতি'— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৫ সালের অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে প্রথমটি বিশ্বভারতী পত্রিকার ১৩৬২ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় ও দ্বিতীয়টি ইতিহাস পত্রিকার ১৩৬১-৬২ সালের ফাল্গুন-বৈশাখ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

অন্য প্রবন্ধদুটি 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' ও 'ইতিহাস' অনেক দিন পূর্বের লেখা। প্রথম প্রবন্ধটি 'সবুজপত্রের' ১৩২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ও দ্বিতীয়টি 'বিচিত্রা'র ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক বিষয়ে চিন্তা ও ভাবের সমতার জন্য ও দুটি প্রবন্ধ এ বইয়ে ছাপানো হল।

ভাদ্র ১৩৬৪ অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাংলার নবীন ঐতিহাসিকগণকে
একজন সাধারণ ইতিহাস-পাঠকের
এই অনধিকারচর্চা
উৎসর্গ করিলাম।

ইতিহাসের মুক্তি

মানুষ মানুষের কথা শুনতে ভালোবাসে— প্রাচীন মানুষের কাহিনী, সমকালীন মানুষের সংবাদ। আধুনিক সভ্য জগতে এই দ্বিতীয় চাহিদার যোগান দেয় খবরের কাগজ। প্রথম আকাঙ্ক্ষাটি পূরণের জন্য অনেক পূর্ব থেকেই মানুষ রচনা করছে ইতিহাস। কোনো ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই স্বীকার করতে রাজি হবেন না যে তাঁদের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সমধর্মী। ইতিহাস গড়ার মালমসলা, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সম্ভব অসম্ভব নানা মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের জন্য ঋজু পথে ও কুটিল কৌশলে সাংবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের সমতুল্য? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগুরু যাচাই করে সম্পাদকীয় সন্দর্ভ যে তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ করে, সংগৃহীত উপকরণের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ও নির্মম বিচারে খাঁটি সত্য নির্ণয় করে ঐতিহাসিক সে ব্যাপারের যে বিবরণ দেন ও তার মর্মগত ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার করেন, সে কি ঐ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সমগোত্রীয়? নিজ কর্মের গুরুত্বে অবহিত কোনো আত্মসম্মানী ঐতিহাসিক এমন কথা

ভাবতে পারেন যে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক। যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফাউলার তাঁর রোমের চটি ইতিহাসে, প্রাচীন রোমান সেনেটের যে বিবরণ পণ্ডিতেরা অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষায় সংগ্রহ করেছেন, তার কিছু পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে, এসব পাণ্ডিত্য বিস্মৃতির অতলে ডোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি ঐ রোমান সেনেটের একদিনকার অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ যদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে পারতেন।

খবরের কাগজের সঙ্গে ইতিহাসের নাম একসঙ্গে উচ্চারণে ঐতিহাসিকের বিরক্তির কারণ তার চেষ্টা ও সৃষ্টিকে খেলো করে দেখাতে। যে বিচারবুদ্ধি ও মননশক্তি, সত্যসন্ধিৎসা ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনা ইতিহাস-রচনায় প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানকর্মের সঙ্গে। সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকৃতরুচি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের উচ্চাঙ্গ মানসিক চেষ্টাকে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে হেয় করার মুখ্য কথা নয়। বড় কথা ইতিহাসের

লক্ষ্যকেই ছোট করে ফেলা। মনের নানা খেয়ালখুশির চরিতার্থতায় মানুষ অনেকরকম সৃষ্টি করেছে। রাজা-রাজড়া এবং বীরপুরুষেরা প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী শুনতে চেয়েছে। চারণেরা কিম্বদন্তী ও কল্পনায় মিশিয়ে গাথা রচনা করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে। মানুষ সাধারণ ও অসাধারণ মানুষকে নিয়ে হাসি-কান্না উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয়। তাই কথা-সরিৎসাগরের মতো বই দেশে দেশে লেখকেরা লেখে। মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। পড়তে-লিখতে-জানা আধুনিক পৃথিবী গল্প-উপন্যাসে ছেয়ে গেছে। কিন্তু ইতিহাস এসব মনোরঞ্জকদের দলে নয়। তার লক্ষ্য উঁচু। অতীতের কাহিনী সে বলে বটে— সমস্তরকম মিথ্যা রাগ-বিরাগ-কল্পনার খাদ -মুক্ত অতীতের খাঁটি সত্য। কিন্তু সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের কাজ নয়, যদিও গল্প সত্য হলে লোকের তাতে বেশি অনুরাগ। লোকে ভূতের গল্পেও সত্য-ভূতের গল্প শুনতে চায়; কারণ গল্প-বলাটা ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় মাত্র। ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। তত্ত্বদর্শী

জ্ঞানীরা যেসব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগ্‌দর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।

২

ইতিহাসের এই উপদেষ্টার পদগৌরব অনেক কাল থেকে স্বীকৃত হয়ে আসছে। দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, যেসব লোক আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও বলেন ইতিহাসের মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি, সেইসব অল্পবুদ্ধি অরসিক সাধুলোকদের নমস্কার করেছেন।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্‌মুখায়॥

ধনঞ্জয়ের মতে নাট্যের স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবান্তর। কিন্তু ইতিহাসের কাজ যে আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তাঁর এ অভিমত সুস্পষ্ট।

ধনঞ্জয় আধুনিক লেখক। মাত্র হাজার বছর পূর্বেকার লোক। কিন্তু ধনঞ্জয়ের সময়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশের নানা পুঁথিতে ইতিহাস নামে বিদ্যার উল্লেখ আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে দ্বিজাতির পাঠ্যের তালিকায় একটি পাঠ্যবিষয় হচ্ছে ইতিহাস।

বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হি যোঽন্বহম্॥

আচার, ৪৫

বেদাথর্বপুরাণানি সেতিহাসানি শক্তিতঃ।
জপযজ্ঞার্থসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাং চাঽধ্যাত্মিকীং জপেৎ॥

আচার, ১০১

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি খুব কম করেও ধনঞ্জয়ের পাঁচ শো বছর পূর্বের।

মনুস্মৃতিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের সময় যেসব শাস্ত্র পড়ে শোনাবার বিধি আছে তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈব হি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ॥ ৩।২৩২

মনুস্মৃতির যে পুঁথি আমরা পেয়েছি, খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকে মেধাতিথি যার ভাষ্য লিখেছিলেন, তার রচনা

.বা গ্রন্থন -কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। কিন্তু কোনোমতেই সে রচনাকাল খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের পরে নয়। তার চেয়ে দু-তিন শো বছর পূর্বে হওয়াই খুব সম্ভব।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সামবেদ ঋগ্‌বেদ ও যজুর্বেদ এই ত্রয়ীর বাইরে ইতিহাসকেও অথর্ববেদের সঙ্গে বেদ বলা হয়েছে।

সামর্গ্যজুর্বেদাস্ত্রয়স্ত্রয়ী।
অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ॥

প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়

ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝা যায় যে, নানা বিদ্যাকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অর্থে শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। ওর অর্থ কী তা রাজার নানাবিদ্যাচর্চার প্রসঙ্গে কৌটিল্য নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। রাজা দিনের পূর্বভাগে যুদ্ধের নানা অঙ্গের বিদ্যা শিখবেন।

পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে। পুরাণমিতিবৃত্তমাখ্যা-
য়িকোদাহরণং ধর্মশাস্ত্রমর্থশাস্ত্রং চেতীতিহাসঃ॥

দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যায়

দিনের শেষভাগে ইতিহাস-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র,

অর্থশাস্ত্র— এদের বলে ইতিহাস। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রচনাকাল পণ্ডিতদের বিরাট তর্কস্থল। কিন্তু অপণ্ডিত লোকও যদি প্রচলিত মনুস্মৃতির সঙ্গে এ অর্থশাস্ত্র পড়েন তবে প্রতীতি হতে দেরি হয় না যে, কৌটিল্যের বহু অংশ মনুস্মৃতির চেয়ে প্রাচীনতর। সুতরাং যে পণ্ডিতেরা অর্থ-শাস্ত্রের রচনাকাল বলেন খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক তাঁদের মত অগ্রাহ্য করবার কোনো সংগত কারণ নেই।

গৌতমধর্মসূত্রে, যেসকল বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষা করেন তাঁদের বহুশ্রুতত্ব-লাভের জন্য যেসব বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয় তার মধ্যে ইতিহাস একটি।

> দ্বৌ লোকে ধৃতব্রতৌ রাজা ব্রাহ্মণশ্চ বহুশ্রুতঃ। ৮।১
>
> স এষ বহুশ্রুতো ভবতি।
>
> লোকবেদবেদাঙ্গবিৎ।
>
> বাকোবাক্যেতিহাসপুরাণকুশলঃ ॥ ৮॥৪-৬

বাকোবাক্য নামে বিদ্যাটির উল্লেখ যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির বচনেও আছে— টীকাকারেরা ব্যাখ্যায় বলেছেন প্রশ্নোত্তর-রূপ বিদ্যা, সম্ভব তর্কশাস্ত্র, গ্রীসে Socratic dialogue -এ যার আরম্ভ।

যেসকল প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি টিঁকে আছে বা

এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতমধর্মসূত্র তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এর যেসব প্রসঙ্গ কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের সঙ্গে এক তাদের মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে, গৌতমধর্মসূত্রের ব্যবস্থা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা। পণ্ডিতপ্রবর কানে তাঁর 'ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃস্টপূর্ব ছয় শো থেকে চার শো শতকের পরে নয়। এ মত গ্রহণযোগ্য।

অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আমাদের দেশে ইতিহাস নামে বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল ও চর্চা চলেছিল। এ বিদ্যার স্বরূপ কী ছিল ?

৩

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ত্র ও অর্থ-শাস্ত্রের গণনা স্পষ্টই পারিভাষিক ব্যাপার। ওর মূল অপারিভাষিক অর্থ, অন্য যেসব বিদ্যার নাম করা হয়েছে তাদের সমষ্টি— পুরাতনকালের বৃত্তান্ত, আখ্যায়িকা ও তাদের মধ্যে যে উপদেশ নিহিত আছে, যেসব ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকম উদাহরণের বেশ একটু চমকপ্রদ নমুনা কৌটিল্য থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

কৌটিল্য রাজাকে বাইরের ও ঘরের নানা শত্রু থেকে আত্মরক্ষায় সাবধানতার উপদেশ করেছেন। তার মধ্যে একটি উপদেশ এই: অন্তঃপুরে মহিষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে রাজা পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে অনুসন্ধান নেবেন যে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিয়ে একাকী যাবেন না, কারণ—

দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান।
মাতুঃশয্যান্তর্গতশ্চ পুত্রঃ কারূশম্।
লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্যস্য দেবী কাশিরাজম্।
বিষদিগ্ধেন নূপুরেণ বৈরন্ত্যং মেখলামণিনা সৌবীরং।
জালূথমাদর্শেন বেণ্যাগূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী
বিদূরথং জঘান। ১৷৷১৭

পট্টমহিষীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভদ্রসেনকে তার ভাই হত্যা করেছিল। মার শয্যার তলে প্রচ্ছন্ন থেকে কারূশ-রাজাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মধুর ছলে খইয়ে বিষ মেখে কাশিরাজের মহিষী তাকে হত্যা করেছিল। বিষদিগ্ধ নূপুরের আঘাতে বৈরন্ত্য-রাজাকে, মেখলামণির আঘাতে সৌবীর-রাজাকে, মুকুরের আঘাতে জালূথ-রাজাকে তাদের মহিষীরা হত্যা করেছিল। বেণীতে

অস্ত্র লুকিয়ে রেখে বিদূরথ-রাজার মহিষী বিদূরথকে হত্যা করেছিল।

সন্দেহ নেই যে, কৌটিল্য প্রকৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত -বোধেই উদাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কল্পিত আখ্যায়িকার নয়। সে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিম্বদন্তীর যতই মিশ্রণ থাক্। অজ্ঞাত-অতীতের ভদ্রসেন-বিদূরথের হত্যা থেকে হাল-আমলের 'লিকুইডেশন' পর্যন্ত ক্ষমতালোভী মানুষের ছল ও নিষ্ঠুরতার পরিবর্তন হয় নি।

৪

মনুস্মৃতির যে শ্লোকে 'ইতিহাসাংশ্চ' ব'লে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখেছেন, 'ইতিহাসা মহাভারতাদয়ঃ'। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির 'ইতিহাসাং-স্তথা'র ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরায় ঐ এক কথাই বলেছেন, 'ইতিহাসান্মহাভারতাদীন্'। মেধাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর মনুর তুলনায় অনেক আধুনিক। মেধাতিথি খৃস্টীয় অষ্টম কি নবম শতকের, বিজ্ঞানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্তু ইতিহাস যে মহাভারতের মতো গ্রন্থ এ ঐতিহ্য প্রাচীন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে

অথর্ববেদের সঙ্গে ইতিহাসকে বেদ বলা, ও মহাভারত যে পঞ্চম বেদ এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মনুস্মৃতির কোথাও নাম করে মহাভারতের উল্লেখ নেই। অনেকে মনে করেন যে, মনুস্মৃতির বর্তমান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের মহাভারতের রচনা হয় নি। কিন্তু মহাভারতের মূল কাহিনী অবশ্য অনেক প্রাচীন; এবং সে কাহিনী নিয়ে অনেক রচনা, অনেক গাথিকার নিশ্চয় সৃষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায়েই সে স্বীকৃতি রয়েছে। সৌতি বলছেন, অদ্ভুতকর্মা ব্যাসের যে রচনা তিনি শোনাতে যাচ্ছেন—

আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি॥

আদি, ১।২৬

সে ইতিহাস কোনো কোনো কবি পূর্বে আংশিক বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন, এবং অন্য কবিরা ভবিষ্যতে বলবেন। এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে যে অনেক কল্পিত উপাখ্যানের মিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা মহাভারতে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের শ্লোক-সংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু উপাখ্যান বাদ দিয়ে যে চব্বিশ

হাজার শ্লোকে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচনা করেছিলেন পণ্ডিতেরা তাকেই বলেন প্রকৃত মহাভারত।

ইদং শতসহস্রন্তু শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।
উপাখ্যানৈঃ সহ জ্ঞেয়ং শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্॥
চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

আদি॥ ১। ৬৩-৬৪

অনুমান করা কঠিন নয় যে, লক্ষকে কেটে নয়, চব্বিশ হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনাটিই মূল ভারতেতিহাস। সে কাহিনী যে ঐতিহাসিক, প্রাচীনকালে সত্য সত্যই ঘটেছিল, প্রাচীনদের এ বিশ্বাস দৃঢ়। আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তাঁরা মহাভারতের কাহিনীকে ভিন্ন করে দেখেছেন। পুরাণের কথায় মেধাতিথি বলেছেন, 'পুরাণানি ব্যাসাদিপ্রণীতানি সৃষ্ট্যাদিবর্ণনরূপাণি', অর্থাৎ যার বেশির ভাগ কল্পনা। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা মহাভারতের কাহিনীকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন, যেমন থুকিডিডেস হোমার-বর্ণিত ট্রোজান-যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মনে করেছেন। তবে মহাভারতের কাহিনীও যে উপদেশাত্মক, শাস্ত্রকারেরা সে কথা বলতে ভোলেন নি। মনুস্মৃতির সপ্তম অধ্যায়ে বিনয়ের সুফল ও অবিনয়ের

কুফল -বর্ণনা আছে। জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশে চলার নাম বিনয়, তাকে অগ্রাহ্য করা অবিনয়। অবিনয়ের ফলে রাজারা সপরিগ্রহ বিনষ্ট হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশহীন বনবাসীও রাজ্যলাভ করে। উদাহরণ,

বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পর্থিবঃ।
সুদাস-যাবনিশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ।
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ। ৭॥ ৪১-৪২

মেধাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাষ্য করেছেন, 'এতানি মহাভারতাদাখ্যানানি জ্ঞেয়ানি'। এবং মহাভারতেই তার উপদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আছে। 'এতে চার বেদেরই কথা আছে, এ কাহিনী পবিত্র ও পাপভয়হারী'।

বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাম্॥
আদি॥ ১।২১

নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সৌতির কাছে সোপাখ্যান লক্ষ-শ্লোকের 'শ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্' শুনতে চেয়েছিলেন।

৫

মহাভারতের কাহিনী থেকে নানা উপদেশ-সংগ্রহ কিছুই কঠিন নয়। মানুষের অনেক কর্মচেষ্টা ও তার পরিণতি

থেকেও কঠিন নয়। কিন্তু মহাভারতের দীর্ঘ ও বিচিত্র ইতিহাসের রচনা হয়েছিল গুটিকয়েক উপদেশের উদাহরণ-স্বরূপে— ঐ উপদেশই লক্ষ্য, কাহিনীর বর্ণনাটা উপলক্ষ— এমন কল্পনা সুস্থ মনের কল্পনা নয়। কোনো তত্ত্বের মায়ায় বুদ্ধির বিভ্রান্তি না ঘটলে সর্পে এমন রজ্জুভ্রম হয় না। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা মহাভারত-কথা শোনার জন্য সৌতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন, কারণ সে কথা বিচিত্র— 'চিত্রাঃ কথাঃ'।

তমাশ্রমমনুপ্রাপ্তং নৈমিষারণ্যবাসিনঃ।
চিত্রাঃ শ্রোতুং কথাস্তত্র পরিবব্রুস্তপস্বিনঃ॥

আদি ॥ ১।৩

যে কাহিনী বিচিত্র, গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়, তা মানুষের মনে গভীর দাগ কাটে। মানুষ সে কাহিনী ভুলতে চায় না। তাকে রচনায় নিবদ্ধ করে স্থায়ী করে রাখতে চায়। উপদেশের চিরকালীন ভাণ্ডবোধে নয়, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়িত্ব দেবার মনের স্বাভাবিক প্রবণতায়। 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং'। কিন্তু সমাজের হিতে যাঁরা অনন্যচিত্ত তাঁরা একে উপদেশের পুণ্যজলে শোধন করে মানুষের কাজে লাগাতে চান। ঐতিহাসিক কাহিনী যে কাহিনীমাত্র নয়, সংসারের যাত্রাপথে অঙ্গুলিসংকেত,

সে শিক্ষা তাঁরা ইতিহাসের কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত করেন— সহজে বা কষ্টে। সমাজহিতৈষীদের 'প্রবৃত্তি-রেষা'। ঐতিহাসিক বলেন, 'তথাস্তু। ভেবেছিলাম অতীত নিয়ে খেলা করছি, কিন্তু দেখি সমাজের হিত করছি। মনে করেছিলাম প্রাচীন কাহিনী-তৃষ্ণার জল এনেছি, কিন্তু দেখছি যা এনেছি তা উপদেশের অমৃত। ধন্যোঽহং।'

৬

বর্তমানে আমরা যাকে বলি 'যথার্থ ইতিহাস' (real history), হোমারের ট্রয়-যুদ্ধের কি বেদব্যাসের ভারতযুদ্ধের ইতিহাসের মতো ইতিহাস নয়, তার লেখকেরাও অনেকে বলেছেন যে, তাঁরা ইতিহাস লিখেছেন কেবল অতীতের কাহিনীকে বর্ণনার জন্য নয়, যাতে অতীতের কাহিনীর আলোতে বর্তমানের ও ভবিষ্যতের পথ-বিপথ চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে। থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, যাতে সেই অতীত ঘটনা থেকে এর পর অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করা যায়। পলিবিয়াস রোম-কার্থেজ-যুদ্ধের ইতিহাসে ঘটনার কার্যকারণ-সম্বন্ধের অনুসন্ধান করেছেন,

যাতে ভবিষ্যতের সদৃশ ঘটনায় এ সম্বন্ধের প্রয়োগ করা যায়। ইউরোপের কেবল গ্রীক কি গ্রীকো-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাস লোকশিক্ষক— ন্যায়পথের শিক্ষা দেয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানের সে পরামর্শদাতা। এই কল্পনাকে মৃদু উপহাস করে র‍্যাঙ্কে তাঁর বিশ্ব-ইতিহাসের গোড়ায় বলেছেন, 'ইতিহাসের উপরে যে কর্তব্য ন্যস্ত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া, সে গুরুভার-বহনে তিনি অক্ষম। তিনি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন যে, যা ঘটেছে তা ঠিক কেমন করে ঘটেছে।'

শাস্ত্রকৃৎ কি দার্শনিকেরা যে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিককে উপদেষ্টার আসনে বসিয়েছেন সে সম্মান বহু ঐতিহাসিক লিওপোল্‌ড্‌ র‍্যাঙ্কের মতো প্রত্যাখ্যান করেন নি। সে মর্যাদা ও সম্মান শিরোধার্য করেছেন এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু যদি বাইরের দেওয়া পদবীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে ঐতিহাসিকেরা তাঁদের নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখেন 'কিমিদং' তবে

ইতিহাসের স্বরূপ ও লক্ষ্যের যথার্থ জ্ঞান, বৌদ্ধেরা যাকে বলেন 'সম্যক্ জ্ঞান', তা লাভ হয়।

থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের গ্রন্থ এই বলে আরম্ভ করেছেন :

'এথেন্সবাসী থুকিডিডেস পেলপনেসিয়ান ও এথেনিয়ান-দের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস সংকলন করেছেন। যুদ্ধের সূচনাতেই তিনি লিখতে আরম্ভ করেন এই ধারণায় যে, পূর্বে পূর্বে যা সব ঘটেছে এ যুদ্ধের গুরুত্ব তাদের চেয়ে অনেক বেশি। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রীস দেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অন্য পক্ষে যোগ দিয়েছে বা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রীকেরাও যোগ দিচ্ছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের, কথা কালের ব্যবধানে সম্পূর্ণ জানা যায় না। কিন্তু অনুসন্ধান ও গবেষণায় যতদূর জানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না যে অতীতের কোনো যুদ্ধ বা ঘটনার এই যুদ্ধের মতো গুরুত্ব ছিল।'[১]

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরি-প্রেক্ষিতে থুকিডিডেসের পেলপনেসিয়ান-যুদ্ধের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় মাত্রাজ্ঞানহীন মনে হওয়া

স্বাভাবিক। যেমন এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌ বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত ও যুদ্ধটা ছিল একটা মাঝারি রকমের ঝগড়া ; ওর স্মৃতি একটু বেশি টিঁকে আছে এইজন্য যে, থুকিডিডেস তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। থুকিডিডেসের ধারণায় বিজ্ঞতার হাসি হাসার পূর্বে মনে করা ভালো যে, যেসব ঘটনা ও ব্যাপারের গুরুত্বে ও ব্যাপকত্বে আকৃষ্ট হয়ে বর্তমানের ঐতিহাসিকেরা ইতিহাস লিখছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাঁদের ধারণা লোকে কী চোখে দেখবে— অবশ্য যদি ততদিন তার স্মৃতি বেঁচে থাকে।

থুকিডিডেস তাঁর গ্রন্থোৎপত্তির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, উপদেশ দেবার মহৎ কর্তব্য পালনের জন্য তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। এ রচনায় তাঁর প্রবৃত্তি এসেছিল, কারণ এ যুদ্ধের কাহিনী তাঁর মনে হয়েছিল 'চিত্রাঃ কথাঃ' ; এবং অতীতের সমস্ত ঘটনার তুলনায় 'বিচিত্রাঃ কথাঃ'।

এর পর থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনারীতির কথা বলেছেন :

এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা

করি নি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয় নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।'

৭

থুকিডিডেসকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার গুরু। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনাশূন্য অনাবিল কাহিনী রচনায় যে সূত্রের তিনি সূত্রকার, আধুনিক ঐতিহাসিক রীতিকে তার ভাষ্য বলা যায়। অবশ্য অতি বিস্তৃত ভাষ্য। কারণ, আধুনিক কালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও মূল্যবিচারের চেষ্টা ও পদ্ধতি যেমন বিপুল তেমনি জটিল।

দু-তিন শো বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞানবিদ্যা ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ের সহায়, যার কল্পনাও থুকিডিডেসের কালে সম্ভব ছিল না। বহু বিজ্ঞানবিদ্যার সুপ্রতিষ্ঠা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে ঐতিহাসিককে অনেক প্রাচীন মূলহীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এসব দৃষ্টফল বিদ্যার সার্থক অনুশীলন সত্যমিথ্যা-পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, ইতিহাসের তথ্যনির্ণয়ে ঐতিহাসিককে তা প্রভাবিত করেছে। তার স্বীকৃতির সঙ্গে উৎকর্ষের দাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহাসকার নিজের রচিত ইতিহাসের নাম দিয়েছেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস,' অর্থাৎ যা প্রাচীনদের ঢিলেঢালা ইতিহাস থেকে ভিন্ন। এ নামকরণে সত্যাভাস কিছু আছে, নামের মহিমায় বস্তুর তথ্যপ্রকাশের চেষ্টায় যা অপরিহার্য। কিন্তু আজকের দিনের ঐতিহাসিকের হাতে সত্যনির্ণয়ের যা-সব উপায় এসেছে তার তুলনায় প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ছিলেন রিক্ত-অস্ত্র মুষ্টিযোদ্ধা মাত্র। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস রচনা থুকিডিডেসের কাছে খুব সম্ভব মনে হয় নি। কারণ, তত পূর্বের ঘটনা সম্পূর্ণ জানা যায় না। বস্তুত থুকিডিডেসের একুশ বছরের ইতিহাস তাঁর সমকালীন ঘটনার ইতিহাস। পলিবিয়াসের পিউনিক-

যুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেমন না হলেও প্রায় সমধর্মী। দূর-অতীতের ইতিহাসের উপকরণ-সংগ্রহে আধুনিক ঐতিহাসিকদের রীতিপদ্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক সূক্ষ্ম। যে প্রাচীনেরা তাঁদের কালের ইতিহাস লিখে গেছেন বা এমন বিবরণ লিখে গেছেন যা থেকে ইতিহাসের মালমসলা পাওয়া যায়, সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু দিক থেকে পরীক্ষা করে সত্যনির্ণয়ের অসীম চেষ্টা— যে কাজকে থুকিডিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ— আধুনিক ইতিহাস-লেখকেরা নিত্য করছেন। বিবরণের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন্ কালের, যে প্রাচীন ভাষা ও লিপির স্মৃতি লোপ হয়েছে তার পাঠোদ্ধার, মানুষের সভ্যতার যেসব সৃষ্টি মাটির নীচে চাপা পড়েছে মাটি খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ, মনে হয় যেন অসাধ্যসাধন। সে অসাধ্যসাধন আধুনিক ইতিহাসবিদ্যার সাধারণ কাজ। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনো কিছুর উপলক্ষ হিসাবে নয়, ঐ জ্ঞানই ঐতিহাসিকের চরম লক্ষ্য ব'লে। অতীতের নির্ভুল নিখুঁত জ্ঞানলাভের এই বিদ্যা মানুষ সৃষ্টি করেছে। সেই বিদ্যার ও তার আদর্শের আকর্ষণ ইতিহাস-

কারের উদ্যমের উৎস। সেই আদর্শে পৌঁছবার কোনো শ্রমকেই শ্রম মনে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়া অন্য যে-কোনো মাপকাঠির মাপে ঐতিহাসিকের অনেক শ্রম মনে হবে নিরর্থক পণ্ডশ্রম। যীশু জন্মেছিলেন খৃস্টপূর্ব চার অব্দে না দশ অব্দে, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে না রবিবার প্রাতে, সে গবেষণায় শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয়ের আর কোন্ সার্থকতা আছে? সে সার্থকতা হচ্ছে সত্য আবিষ্কার ও সত্য কথনের ঐতিহাসিক আদর্শ থেকে অবিচ্যুতি। সত্যের জন্যই সত্যের অনুসরণ। 'সত্যে নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ'— ঐতিহাসিকের সে ভয় হচ্ছে ঐতিহাসিক সত্যের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হবার ভয়। অন্য কোনো ভয় নয়। ইতিহাসের উদ্দেশ্য যদি হত অতীত সত্য ঘটনার উদাহরণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া— ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের নীতি— তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপদেশের বেশি উপযোগী হত। অনলংকৃত নিরাবরণ সত্যের চেয়ে কল্পনায় রাঙানো ও সাজানো কাহিনীর আকর্ষণ লোকের কাছে অনেক বেশি— যে আকর্ষণের অভাব আছে বলে থুকিডিডেস তাঁর ইতিহাস-রচনার ব্যাজনিন্দা করেছেন। যে কারণে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা

সোপাখ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন।

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিদ্যার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মযাজকেরা। তাঁরা যে ইতিহাস তখন লিখেছেন তার বেশির ভাগ খৃস্টধর্মের নানা ঘটনার ও খৃস্টান সাধুসন্তদের জীবনের ইতিহাস। সে ইতিহাসকে বিচিত্র কল্পনায় পুষ্ট ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি ও ভয় গাঢ় করার চেষ্টা দোষের ছিল না। তাতে লেখকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ প্রয়োজনে অসত্যকথনেও দোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক ঊর্ধ্বে। সে কাল গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরে নি। আজ ক্রমশ ধর্মের দাবির জায়গা নিচ্ছে রাষ্ট্রের দাবি। ধর্মগুরুর আসনে বসেছে রাষ্ট্রনেতা। সেই ইতিহাস হবে তাঁদের কাম্য যাতে রাষ্ট্রের উপর, অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতাদের উপর, লোকের ভক্তি ও ভয় প্রবল ও প্রগাঢ় হয়। তাতে যদি কিছু অসত্যভাষণের প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে রাষ্ট্রসচেতন ঐতিহাসিকের দেশপ্রেম। ইউরোপের মধ্যযুগে থুকিডিডেসের ইতিহাসের আদর্শ বেঁচে ছিল না। আজ সে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশি

কঠোর হয়েছে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিকের অভাব হবে না। শোনা যাবে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস নয়। কেবল সত্যভাষণের আদর্শ থেকে তার লক্ষ্য অনেক উঁচুতে, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মঙ্গল।

৮

এক কাল ছিল যখন, আজ যেসকল বিদ্যা নিজের গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ তার অনেকগুলি ছিল অন্য সাধনার অঙ্গ ও উপায়। সেই উপায়ের কাজ সম্পন্ন করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্তু মানুষের চঞ্চল কর্মকৃৎ মন ও প্রতিভা উপায়ের গণ্ডি ভেদ করে স্বতন্ত্র বিদ্যায় তাদের গড়ে তুলেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাঙ্গবিদ্যাগুলি তার উদাহরণ। যে বিদ্যা ছিল বেদমন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ ও সত্য অর্থ গ্রহণের উপায় মাত্র, তা গড়ে উঠল ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞান হয়ে। ছন্দঃশাস্ত্র বৈদিক ছন্দোবিচারে আবদ্ধ থাকল না। জ্যোতিষ ও জ্যামিতি বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন স্বতন্ত্র বিদ্যায় পরিণতি পেল। মানুষের প্রতিভার এসব সৃষ্টি ও বিদ্যার চর্চাকে বৈদিক কুলপতিরা সুনজরে দেখেন নি। মনুসংহিতায় তার স্মৃতি রয়ে গেছে। ‘যে দ্বিজ বেদ

অধ্যয়ন না করে অন্য বিদ্যায় শ্রম করে এই জন্মেই তার সবংশ আশু শূদ্রত্বপ্রাপ্তি হয়।'

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ ২।১৬৮

'অন্যত্র' কথার ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেন, 'শাস্ত্রাঙ্গেষু তর্কশাস্ত্রগ্রন্থেষু বা।' কুল্লুক সোজাসুজি বলেছেন, 'অর্থশাস্ত্রাদৌ।' সর্বজ্ঞ নারায়ণ শুধু বলেছেন, 'অন্যত্র শাস্ত্রে,' অর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্য বিদ্যায়।

ইউরোপের মধ্যযুগে খৃস্টান ধর্মতত্ত্বের আলোচনা ছেড়ে অন্য বিদ্যার যারা চর্চা করত ধর্মগুরুরা তাদের সন্দেহের চোখেই দেখতেন। এর প্রেরণা যে ভগবানের নয়, আসে শয়তানের কাছ থেকে, সে সম্বন্ধে তাঁরা প্রায় নিঃসংশয় ছিলেন। ফাউস্টের প্রাচীন গল্প এর উদাহরণ। ধর্ম ও নীতির রথচক্রের বন্ধন থেকে বিদ্যাগুলির মুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে। ইতিহাসেরও ঘটেছে সেই মুক্তি। কিন্তু কোনো বন্ধন থেকে মুক্তিই চরম মুক্তি নয়। মুক্তিকে রক্ষার জন্য মানুষকে অতন্দ্র থাকতে হয়। কারণ পুরাতন বন্ধন নূতন নূতন রূপে মানুষের মুক্ত মন ও বিদ্যাকে আবার বাঁধতে চায়। মানুষের মুক্ত মন ও বুদ্ধির উপর

আজকের পৃথিবী অনুকূল নয়। সম্ভব ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৯

প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা খেয়াল-পরিতৃপ্তির উপায় মাত্র, মানুষের কোনো কাজে লাগে না? মানুষ নিজের কাজেই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, সুতরাং মানুষের তা কাজে লাগে। কিন্তু যে মানুষের কাজে লাগে সে মানুষ সত্যের পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তত্ত্বের মাপে কাটাছাঁটা প্রমাণসই, স্ট্যাণ্ডার্ডাইজ্ড্ মানুষ নয়। মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় মুখ্যত জীবনযাত্রার প্রয়োজনে। সুতরাং প্রয়োজনসিদ্ধির কাঠামে সে বস্তুকে পুরতে চায়। তাতে বস্তুর সমগ্রতা ধরা পড়ে না। কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠামের কাজ নয়; তাতে কাঠামো-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। কার্যসিদ্ধির জন্য যা প্রয়োজন তা থেকে নিষ্প্রয়োজন অবান্তরকে দূরে রাখার জন্যই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে, প্রয়োজনসিদ্ধির দৃষ্টিতে তা অবস্তু। তাকে অগ্রাহ্য করেই কাজ চলে এবং অগ্রাহ্য করলেই কাজ ভালো চলে। ক্রমে মানুষের ব্যাবহারিক মনের ধারণা জন্মে যে, কাঠামোর মধ্যে যা

রয়েছে তাই বস্তু, তার বাইরে বস্তুর আর অস্তিত্ব নেই।

আজ যারা সভ্য মানুষ, একদিন ছিল যখন তাদের পূর্বপিতামহদের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয় হত শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার আহার আবাস ও আচ্ছাদন সংগ্রহের চেষ্টায়। সে মানুষের কাঠামো বুদ্ধিমান দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামো। তার পর অনেক হাজার বছরের নানা সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের মন শরীরের একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মুক্ত বাহুল্য মন সৃষ্টির প্রেরণায় ও আনন্দে বহু সৃষ্টি করে চলেছে যা শরীরের কাজে লাগে না, বাহুল্য মুক্ত মনের কাজে লাগে। কাব্য ও সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাস্কর্য সবই এই মুক্ত মনের সৃষ্টি। কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্মৃতি মানুষের মনে বেঁচে আছে। তার এক কারণ, অনেক মানুষের মন আজও শরীরের সেই একান্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। তাই যখন প্রশ্ন হয়, এ বস্তু মানুষের কোন্ কাজে লাগে, তখন প্রশ্নকর্তা যে মানুষের কথা বলেন সে মানুষ হচ্ছে দেহসর্বস্ব জীবের কাঠামোর মানুষ। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কাজে লাগে কি না। যত গাম্ভীর্য ও মুরব্বিয়ানার সঙ্গে প্রশ্ন হোক না কেন, একটু বাজিয়ে

দেখলেই আওয়াজ চিনতে ভুল হয় না। যে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিহাসও মানুষের মুক্ত মনের সৃষ্টি। তাকে শরীরের কাজে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহু শরীরের সমষ্টি মাত্র তার কাজেও লাগানো যায় না। চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিস্ময়। সেই চিরবিস্ময়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

ইতিহাসের রীতি

ঘটনা ঘটে অবিচ্ছেদে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। কালে নিরবচ্ছিন্ন, দেশে পৃথিবীব্যাপী, মানবসমাজে বিধৃত এই ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ ইতিহাস নয়। তাকে ইতিহাসের উপাদান বললে মিথ্যা বলা হয় না, কিন্তু সত্যও প্রকাশ হয় না। কারণ ঐতিহাসিক যে ইতিহাস রচনা করেন তার সঙ্গে এই ঘটনাপ্রবাহের সম্বন্ধ বস্তু ও তার উপাদান-কারণের সম্বন্ধের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। ইতিহাস-রচনায় বিষয়কে কালে খণ্ডিত ও দেশে সীমাবদ্ধ করতে হয়। অল্পস্থায়ী ঘটনা কি বহুশতাব্দীব্যাপী ব্যাপারের ইতিহাস— ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধ কি রোমান সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস, নন্দকুমারের ফাঁসি কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে দুই মহাযুদ্ধের ইতিহাস— সব ইতিহাস খণ্ডিত কালের, সীমিত দেশের ইতিহাস। কালের খণ্ড ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দেশের গণ্ডি স্বল্পবিস্তার বা দূরপ্রসারী, এইমাত্র প্রভেদ। নিরবধি কালে বিপুলা পৃথিবীর সকল মানুষের ইতিহাস নেই। অনেক ঐতিহাসিক যাকে ঘটা করে বলেন বিশ্ব-ইতিহাস, সে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন কালের ইতিহাসের

সমষ্টি মাত্র। তাদের মধ্যে সে অন্তরঙ্গ যোগ নেই যাতে ঐসব বিভিন্ন ইতিহাস এক ইতিহাস হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ইতিহাসের বিশ্বকোষ বিশ্ব-ইতিহাস নয়। এবং বিশ্ব-ঐতিহাসিকদের বিশ্ব সব সময় বিশ্বের একটা টুকরো, যেখানকার মানুষের কর্মকলাপ ও সভ্যতার গতিপরিণতির সঙ্গে ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে পরিচয়। কারণ ঐতিহাসিক যে সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতার মানুষ তার সঙ্গে ঐ টুকরোটির সবচেয়ে নিকট ঐতিহাসিক আত্মীয়তা। ইবন্ খল্‌দুনের বিশ্ব-ইতিহাস আরবদের অভিযান ও আরবদের সভ্যতা ও অসভ্যতা যে ভূভাগকে প্রভাবিত করেছিল তার ইতিহাস। এসিয়ার পশ্চিম-প্রান্ত, ভূমধ্যসাগরের উত্তর-তীরের ইউরোপ ও দক্ষিণ-তীরের আফ্রিকা— এই ছিল ইবন্ খল্‌দুনের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব। হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাস তাঁর অ্যাব্‌সলিউট বা পরব্রহ্মের মানসের ত্রিকের ছকে ছকে বাস্তবে পরিণতির ইতিহাস। সৃষ্টির অন্তর্গূঢ় আন্বীক্ষিকীর প্রেরণায় ত্রিকের খেলার এ পরিণতি হেগেল দেখেছেন কেবল ভূমধ্যসাগরের চার পাশে ও পশ্চিম-ইউরোপে। মানসের কল্পনায় যাই থাক্, বাস্তবে ঐ ভূখণ্ডই হেগেলের বিশ্ব-ইতিহাসের বিশ্ব। ইতালিয়ান

দার্শনিক ক্রোচে এক জায়গায় বলেছেন যে, 'সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস, এ কথাটা প্রহেলিকা নয়, সত্য।' সে সত্যকে প্রহেলিকা-মুক্ত করতে ক্রোচের দার্শনিক বাগ্‌বিভূতি তাকে বেশ ঘোরালো করে তুলেছে। কিন্তু ও কথার মধ্যে একটা সহজ অদার্শনিক সত্য আছে। ঐতিহাসিক যে ইতিহাসই রচনা করেন, নিকট কি দূর-অতীতের, তিনি তাঁর ঘটনাবলীকে দেখেন নিজের দৃষ্টি-কোণ থেকে। সে দৃষ্টিকোণ মোটের উপর তার সমসাময়িক কালের বিশ্বাস ও বিচারবুদ্ধির দৃষ্টিকোণ। তার ফলে বিশ্ব-ইতিহাস-কার যখন নিজের প্রিয় ও পরিচিত দেশ-কাল ছেড়ে অনাত্মীয় দেশ-কালের ইতিহাসের দিকে তাকান তখন সে দৃষ্টিকোণ থেকে সে ইতিহাসের প্রকৃত রূপ প্রায় দেখা যায় না, দেখা যায় ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কমবেশি বিকৃত রূপ। অথচ নিজের দৃষ্টিকোণ ছাড়া কোনো নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ নেই। এমন মানুষ অবশ্য আছে যার অন্তর্দৃষ্টি অতি অপরিচিত সত্যতারও মর্মস্থান দেখতে পায়। কিন্তু এরকম বিশ্ব-মানবের সংখ্যা কম। এবং তাদের বিশ্ব-ইতিহাস-রচনায় হাত লাগাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

২

ইতিহাস সীমাবদ্ধ দেশে খণ্ডকালের ইতিহাস। কিন্তু সে সীমার মধ্যে ঐ নির্দিষ্ট কালে যত মানবীয় ঘটনা ঘটে, যে ঘটনা মানুষ নিজে ঘটায় বা যা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে, তার কণামাত্রই ইতিহাসের উপাদান। সে ইতিহাস যে বিষয়ের হোক, যত বিস্তৃত যত ঘটনাবহুল হোক।

অশোক মগধের সিংহাসনে বসলেন পিতার উত্তরাধিকারে। পিতামহ ও পিতার যুদ্ধার্জিত বিশাল সাম্রাজ্যের চক্রবর্তী-সম্রাট হলেন। সে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দক্ষিণে কিছু বাদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে গান্ধার দেশ, হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত— যুদ্ধ ও দেশরক্ষার বিজ্ঞানসম্মত, সায়েন্টিফিক, ফ্রন্টিয়ার— বৃটিশ ভারত-সাম্রাজ্যে যার অভাবে সাম্রাজ্য-গর্বী লাট কর্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন। এই বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রু ও অন্তর্বিদ্রোহ থেকে রক্ষার জন্য অশোককে কোনো নূতন যন্ত্র তৈরি করতে হয় নি— পিতামহ ও পিতার গড়া হস্ত্যশ্বরথপদাতির যুদ্ধনিপুণ বিরাট স্থায়ী বাহিনী প্রস্তুত ছিল। রাষ্ট্রের শাসন ও শান্তির জন্য কোনো নূতন ব্যবস্থা অশোক প্রবর্তন করেন নি। পিতৃপিতামহ-প্রবর্তিত নানা শ্রেণীর রাজামাত্য,

তাদের সংঘ ও সংহতি, সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল— এ কালের ভাষায় extensive bureaucratic organization। সৈন্য অমাত্য লোক ও বাণিজ্য -চলাচলের রাজপথ সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের শাসনে ও ভোগে অশোকের রাজত্বের সাত বৎসর অতীত হল, অশনে বসনে, রাজকীয় আড়ম্বরে মগধের পূর্ব পূর্ব সম্রাটদের মতো। বঙ্গোপসাগরের তীরে কলিঙ্গরাজ্য উত্তরাপথে অশোকের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। পিতামহ কি পিতা সে রাজ্য জয় করেন নি। সম্ভব তাঁদের অনুসরণে অশোক কলিঙ্গরাজ্য আক্রমণ করলেন, রাজ্যের সীমা বাড়াতে শক্তিমান রাজারা যা সচরাচর করে থাকেন— 'পেলে তুই বিঘে প্রস্থে ও দীঘে সমান হইবে টানা'। কলিঙ্গ জয় হল। যুদ্ধে বহু লোক হত হল, বহু লোক বন্দী হল, বিজিত দেশের লোকেরা বহু দুঃখদুর্দশা ভোগ করল, এরকম যুদ্ধে যা স্বাভাবিক, সব সময় ঘটে থাকে। কিন্তু অশোকের মনের উপর তার ফল হল, যা যুদ্ধজয়ী রাজার মনে সচরাচর হয় না। পররাজ্যজয়ের নৃশংসতায় অশোকের মনে অনুশোচনা এল। সাময়িক অনুতাপের বিলাস নয়; সম্রাটের জীবনের গতি-পরিবর্তন হল। রাজ্যশাসনের লক্ষ্য বদলে গেল।

অশোকের প্রতীতি হল, রাজার রাজ্যজয় বড়ো জয় নয়, বড়ো জয় আত্মজয়। সে আত্মজয়ের উপায় যে শীলাচরণ গৌতমবুদ্ধের উপদেশে দেশে সুজ্ঞাত ছিল অশোক নিজের জীবনে তার অনুশীলন আরম্ভ করলেন। তাঁর দৃঢ়নিশ্চয় হল, রাজার রাজ্যশাসন প্রজার কেবল বৈষয়িক সুখসমৃদ্ধির চেষ্টায় সফল নয়, রাজার বড়ো কর্তব্য প্রজাদের জীবন তাঁর নিজের জীবনের মতো এই শীলের নীতিতে গড়ে তোলা। অশোক সাম্রাজ্যময় এই শীলের প্রচারের এবং প্রজাদের জীবনে শীল রক্ষা করে চলার ব্যবস্থা করলেন। সম্ভব যে বুরোক্রেসি সমস্ত সাম্রাজ্যে রাজ্যশাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই বুরোক্রেসি হল এই প্রচার ও রক্ষা -ব্যবস্থার প্রধান যন্ত্র। সুতরাং নীতিপ্রচারের পিছনে রাষ্ট্রশক্তির চাপ নিশ্চয় ছিল। রাজার উচিত কি না প্রজার ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবন নিয়মিত করার চেষ্টা নিজের আদর্শ অনুসারে, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভালো কি মন্দ, খুব তর্কের বিষয়। যেমন তর্কের বিষয়, অশোকের রাজশক্তির চেয়ে বহুগুণ ক্ষমতাশালী বর্তমানের রাষ্ট্রের উচিত কি না প্রজার জীবনকে নানা দিক থেকে নিয়মিত, 'কণ্ডিশন্‌ড্‌', করার চেষ্টা, তার ফল শেষ পর্যন্ত ভালো না মন্দ। অশোক

জীবনযাত্রার আদর্শের উপদেশ সাম্রাজ্যময় স্থায়ী রূপ দিয়ে লিখে দিলেন পাহাড়ের গায়ে, আশ্চর্যগড়ন পাথরের স্তম্ভে। গৌতমবুদ্ধের সদ্ধর্মের উপদেশ তিনি জানলেন নিখিল মানবের হিতের জন্য। সুতরাং কেবল নিজের প্রজাদের মধ্যে তার প্রচারে অশোক তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষে তাঁর নিজের রাজত্ব-সীমার বাইরে এবং ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে অন্য সভ্যতার মানুষের নানা রাজ্যে তিনি প্রচারক পাঠালেন। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগস্থাপন আরম্ভ হল। দু হাজার বছরের বেশি হয়ে গেছে, তার ফল ও প্রভাব পৃথিবী থেকে মুছে যায় নি।

এক রাজার রাজত্বের চল্লিশ বছরের ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে তার জুড়ি পাওয়া কঠিন।

এই চল্লিশ বছরে অশোকের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্মেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের জীবনে এবং জীবনের প্রতিদিন ঘটনা ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ চাষী দিনের পর দিন মাটি চাষ করে শস্য ফলিয়েছে, লক্ষ লক্ষ কুমোর কামার ও শিল্পী নানা শিল্প-দ্রব্য গড়েছে। লক্ষ লক্ষ বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছে। শিক্ষকেরা তাদের পড়িয়েছে। পণ্ডিতেরা

জ্ঞানচর্চা করেছে। কবিরা কাব্য রচনা করেছে। দুঃখসুখে অগণিত লোকের প্রতিদিন জীবন কেটেছে। অশোকের রাজত্বের ইতিহাসে এসব লক্ষকোটি ঘটনার স্থান নেই। এ চল্লিশ বছরের মানবীয় ঘটনার তুচ্ছাতিতম ক্ষুদ্র অংশ বেছে নিয়েই তবে অশোকের রাজত্বের ইতিহাস রচনা সম্ভব। যদি অশোকের কালে তাঁর রাজ্যের প্রজাদের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব হত, যেমন জানা যায় বর্তমান কালের কোনো রাষ্ট্রের প্রজাদের; যদি প্রজাদের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব-আনন্দ, শিক্ষার প্রসার, শিল্প ও সাহিত্য -সৃষ্টি, সভ্যতার নানা ক্ষেত্রে তাদের গতি ও উন্নতির পূর্ণ ও যথার্থ খবর পাওয়া যেত, দু পুরুষ পূর্বেকার বিদেশী আগন্তুকের খণ্ড বিবরণের ছিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করতে না হত; এবং অশোকলিপির কথাবস্তু, ও সাম্রাজ্যের সব অংশে সে অনুশাসন পাথরে খুদে প্রজাসাধারণের পড়ার জন্য ছড়িয়ে রাখার তথ্য, লিপির অক্ষরের সুডৌল, লিপিবাহী স্তম্ভের বিস্ময়কর সুঠাম ও মসৃণতা, পশুলাঞ্ছন স্তম্ভশীর্ষের আশ্চর্য কারিগরি— এসব থেকে একটা মোটামুটি অনুমানের উপর নির্ভর করতে না হত, তবে অশোকের রাজত্বকালের ইতিহাস -লেখককে রাষ্ট্রীয়

ও রাজার কর্মানুষ্ঠানের বিবরণ মাত্র দিয়েই ইতিহাস লিখতে হত না; সে কালের আর্থিক সামাজিক ও সভ্যতার ইতিহাস, প্রচলিত ইংরেজি সংজ্ঞায় যাকে বলে economic, social ও cultural history, সব মিলিয়ে অশোকের রাজত্বের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারতেন। কিন্তু যেসব লক্ষ লক্ষ ঘটনা এ সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি, সে ইতিহাস লেখা সম্ভব হত এসব ঘটনার প্রতিটির বিশেষত্ব অর্থাৎ ঘটনাত্ব বর্জন করে, তা থেকে সাধারণ তথ্য ও তত্ত্ব নিষ্কাশন করে। সে কালের নিখিল ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনার পরিমাণের কোনো পরিমাণগত তুলনা থাকত না।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শূন্যতাই সব, বস্তু নেই বললেই চলে। নীহারিকা নক্ষত্র সূর্য গ্রহ উপগ্রহ, বস্তুর দু-চারটে বিন্দু অসীম দূরে দূরে এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। ইতিহাসের যা বস্তু তা অবস্তু ঘটনার মহাকাশে গুটি-কয়েক বিন্দু। সেই বিন্দুগুলি বেছে নিয়েই ইতিহাস রচনা হয় এবং ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। ইতিহাসের দেশ ও কালের সীমায় যে সংখ্যাতীত ঘটনা ঘটে তার অতি ক্ষুদ্র অংশ ইতিহাসের উপাদান। তুলনায় প্রায় সব বাদ দিতে হয়, রাখতে হয় অতি

সামান্য। বাছাই করে কতটুকু রাখতে হবে নির্ভর করে ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপর ও তাঁর ইতিহাস রচনার লক্ষ্যের উপর।

৩

আচার্য মেট্‌ল্যাণ্ড তাঁর ইংলণ্ডের ব্যবহারশাস্ত্রের ইতিহাসে ঘটনার অবিচ্ছিন্নতাকে বলেছেন সেলাই-শূন্য ঠাসবুননি পট— 'a seamless web'। ঐতিহাসিক এই পটে নানারঙা স্তুতোর সেলাই দিয়ে ইতিহাসের প্যাটার্ন ফেলেন। কোনো প্যাটার্নের ঘের খুব বড়, যেমন মম্‌সেনের জুলিয়াস সিজারের ক্ষমতালাভ পর্যন্ত রোমের রিপাব্‌লিকের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাস। আরও বড় ঘের, যেমন গিবনের রোম-সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের ইতিহাস, মার্‌কাস অরেলিয়াসের মৃত্যুর পর থেকে তুর্কীদের কন্‌স্টান্টিনোপল দখল পর্যন্ত প্রায় তেরো শতাব্দীর ইতিহাস। কোনো ঘের তুলনায় অনেক ছোট। যেমন আচার্য যত্নাথের ঔরংজেবের রাজত্বের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস, ভারতবর্ষে মুঘল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূচনার ইতিহাস। বলা বাহুল্য, এ পটের দুই ডাইমেন্‌শন, দেশ ও কাল। কোনো ইতিহাসের ঘের

কালের ডাইমেন্‌শনে দূরপ্রসারী, দেশের ডাইমেন্‌শনে তুলনায় ছোট— যেমন ইতিহাসের প্রকৃত আরম্ভ থেকে আলেক্‌জেণ্ডারের মৃত্যু পর্যন্ত তিন শো বছরের গ্রীসের ইতিহাস। দেশের ডাইমেন্‌শনে প্রকাণ্ড, কালের ডাইমেন্‌শনে অত্যন্ত খাটো— যেমন পৃথিবীর বহু অংশে ব্যাপ্ত বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পাঁচ বছরের ইতিহাস। ইতিহাসের ঘের কালে ও দেশে কত বড়, কি কত ছোট হবে, তার কোনো স্বাভাবিক মাপ নেই। সে মাপ নির্ভর করে ঐতিহাসিক কতটা কালের ও কতখানি দেশের কথা বলতে চান। গত মহাযুদ্ধের ইতিহাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধারম্ভ থেকে যুদ্ধবিরতি পর্যন্ত লিখতে পারেন। কিন্তু সে মহাযুদ্ধের প্রকট ফলাফলও যুদ্ধবিরতিতেই শেষ হয় নি। তার সংঘাতে পৃথিবীর নানা খণ্ডে মানুষের মধ্যে ভাঙাগড়া আজও চলছে। ঐতিহাসিক এ মহাযুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর সময় পর্যন্ত পৃথিবীর নানা খণ্ডে এই ভাঙা-গড়ার বিবরণ তাঁর ইতিহাসের অন্তর্গত করতে পারেন। অথবা একটিমাত্র দেশে, যেমন ইংলণ্ডে কি মার্কিন দেশে, তার ফলাফলের বিবরণে ইতিহাস শেষ করতে পারেন। দেশ ও কাল মানুষের মনের সৃষ্টি কি না দার্শনিকেরা তার বিচার করেন। কিন্তু ইতিহাসের

দেশ ও কাল যে ঐতিহাসিকের মনের সৃষ্টি তাতে সন্দেহ নেই।

৪

দেশ ও কালের ঘেরের মধ্যে ঐতিহাসিক ইতিহাসের যে প্যাটার্ন বোনেন সে প্যাটার্ন কত চওড়া? তার মাপ নির্ভর করে প্রথমত ও প্রধানত, ঐতিহাসিক যে ধরনের ইতিহাস রচনা করেন, ঐ নির্দিষ্ট দেশ ও কালে সে ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনার বহুলতা বা বিরলতার উপর এবং সেসব ঘটনার জ্ঞানের প্রাচুর্য বা দৈন্যের উপর। মগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু পর্যন্ত উত্তর-ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের যে চওড়া প্যাটার্ন তার তুলনায় বৈদিক যুগ থেকে মগধ-সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্যাটার্ন অত্যন্ত সরু, এবং তা হবেই হবে। ঐ প্রাচীনতর কালের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান যে তুলনায় খুব বিরল কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপযোগী ও প্রাসঙ্গিক ঘটনাই ঘটেছিল অত্যন্ত অল্প। লোকের জীবনে রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল কম, কারণ রাষ্ট্রগুলি ছিল শিথিলবন্ধন। সম্ভব অনুসন্ধানের ফলে এ

যুগের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান ক্রমে অনেক বাড়বে, কিন্তু সে জ্ঞান প্রধানত হবে বিচ্ছিন্ন সব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ঘটনার জ্ঞান। এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে অল্পবিস্তর ধারাবাহিক ঘটনার সুতোয় বেঁধে ইতিহাসের প্যাটার্ন বোনা সম্ভব হবে, সে ভরসা করতে সাহস হয় না। কিন্তু প্রাচীনতর কালের জ্ঞান, কি ভারতবর্ষে কি অন্য দেশে, বেশির ভাগ এইরকম বিচ্ছিন্ন জ্ঞান। মানবীয় ঘটনার বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আবিষ্কারকে প্রত্নতত্ত্ব নাম দিয়ে তাদের কেবল ইতিহাসের মালমসলা মনে করা সত্যদৃষ্টি নয়। যে নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের পূর্ব থেকে জ্ঞাত ঘটনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায়, সে জ্ঞান ইতিহাসের মালমসলা। কারণ সে জ্ঞান ইতিহাসের প্যাটার্নকে আর-একটু বেশি চওড়া করে, অথবা ফাঁক পূর্ণ করে সে প্যাটার্নের বুননিকে আরও একটু ঠাসবুননি করে। কিন্তু যে জ্ঞানের এরকম সংযোগ স্থাপন করা যায় না, যা বিচ্ছিন্নই থেকে যায়, সে জ্ঞান মূল্যহীন নয়। মানুষের পরিচয় দেয় বলেই মানুষের কাছে তার মূল্য। মহেঞ্জোদাড়ো কি ক্রীটের মাটি খুঁড়ে মানুষের যেসব চিহ্ন আবিষ্কার হয়েছে সেসব মানুষের সঙ্গে ভারতবর্ষের কি ভূমধ্যসাগরের সভ্যতার ইতিহাসের স্পষ্ট যোগ স্থাপন করা যায় নি।

এবং কোনোদিন যদি নাও যায়, মানুষের এই পরিচয় মানুষের বিস্ময় জাগাবেই। সে বিস্ময় ইতিহাস যে বিস্ময় জাগায় তার সমগোত্র। শেলির Ozymandias এর মতো

> ···Two vast and trunkless legs of stone
> Stand in the desert. ··· Near them,
> on the sand,
> Half sunk, a shattered visage lies···
>
> Nothing beside remains. Round the decay
> Of that colossal wreck, boundless and
> bare
> The lone and level sands stretch far
> away.

কিন্তু ইতিহাসের প্যাটার্নের চওড়ার মাপ কেবল ঘটনার ও তার জ্ঞানের প্রাচুর্য কি বিরলতার উপর নির্ভর করে না; ঐতিহাসিকের প্রতিভার উপরে নির্ভর করে। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগে ইতিহাসের সৃষ্টি। যে ঐতিহাসিক তাঁর কল্পিত ইতিহাসের ধারার সঙ্গে কোনো ঘটনার যোগ দেখতে পান না তাঁর ইতিহাসে স্বভাবতই

সে ঘটনার স্থান নেই। প্রতিভাবান ঐতিহাসিক অনেক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার ঐতিহাসিক যোগ দেখতে পান, সাধারণ ঐতিহাসিকের যা চোখ এড়িয়ে যায়। সেইজন্য যাঁরা ইতিহাসের প্রতিভাবান স্রষ্টা তাঁদের ইতিহাসের প্যাটার্ন অনেক সময় বেশি চওড়া। তাঁদের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনার স্থান আছে, সাধারণ ঐতিহাসিকের ইতিহাসে যাদের স্থান নেই।

৫

দেশ ও কালের অচ্ছিদ্র ঘটনার পটে কিছু ঘটনা বেছে নিয়ে ঐতিহাসিক তাঁর ইতিহাসের ছবি আঁকেন। ইতিহাসের যাঁরা বড় পটুয়া তাঁদের ছবিতে ছোট পটুয়াদের ছবির তুলনায় অনেক সময় ঘটনার রেখা অনেক বেশি। কিন্তু কোন্ ইতিহাসে কত ঘটনা বেছে নিয়ে স্থান দেওয়া যায় তার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। ঐতিহাসিক বহুরকম ঘটনার নানা রঙের সুতোয় তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্ন তোলেন। কিন্তু এমন রঙের সুতো আছে যা সে প্যাটার্নের সঙ্গে 'ম্যাচ' করে না। সে সুতোকে প্যাটার্নের পাশে পাশে চালিয়ে নেওয়া চলে, কিন্তু তা দিয়ে প্যাটার্নের অঙ্গবৃদ্ধি করা চলে না।

ইতিহাসের মুক্তি

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, ইতিহাস বলতে লোকে সাধারণত যা বোঝে তা, যে দেশ ও কালের পূর্ণ পরিচয় দেয় না, তা স্মরণ করে অনেকে এই অঙ্গহীন ইতিহাসের উপর কিছু বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা বলেন, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হবে এমন ইতিহাস যা উদ্দিষ্ট দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিকের পরিচয় দেবে। কেবল রাষ্ট্র গড়া-ভাঙার পরিচয় নয়; সামাজিক পরিবর্তন, ধনতান্ত্রিক বিবর্তন, জীবনযাত্রার প্রণালী ও তার ক্রমপরিবর্তন; ধর্ম শিল্প সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান— সব-কিছুর উত্থান-পতন-পরিবর্তনের পরিচয় দেবে। কোনো দেশ ও কালের মানুষের জীবনের সমস্ত দিক না জানলে যে সে মানুষকে সম্পূর্ণ জানা হয় না এ তো স্বতঃসিদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে tautology। কিন্তু এক ইতিহাসে, অর্থাৎ এক রকমের ইতিহাসে; এসমস্ত কথা বলা সম্ভব নয়, তাও স্বতঃসিদ্ধ। তা জানাতে ও জানতে একই দেশ ও কালের বিভিন্ন রকমের ইতিহাস লিখতে ও পড়তে হয়। কোনো শর্ট কাট নেই। এক জায়গায় সব-কিছু পেয়ে যাব এটা অলস মনের কল্পনা। তারা মানুষের ইতিহাস নিবিড় করে জানতে চায় না। এক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া পড়ে অনেকে যেমন সকল জ্ঞানের জ্ঞানী হতে চায়।

এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উল্লেখ অবশ্য থাকবে। তার উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সীমার বাইরে এমন-সব ঘটনা ঘটেছিল যার মূল্য রাষ্ট্রীয় ঘটনার চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। তেমনি এলিজাবেথের যুগের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে সমকালীন রাষ্ট্রীয় ঘটনার উল্লেখ থাকবে। কতক সাহিত্যের ইতিহাসকে কালক্রমিক কাঠামো দেবার জন্য; কতক সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের উপর রাষ্ট্রীয় ঘটনার প্রভাব পড়েছিল, সেইজন্য। কিন্তু এলিজাবেথের যুগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস জানা যাবে এ আশা তেমনি দুরাশা, যেমন দুরাশা সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস প'ড়ে রাষ্ট্রীয় ইতিহাস জানা যাবে।

রাষ্ট্রীয় ঘটনার ইতিহাসের মধ্যে সেই ঐতিহাসিক যুগের জীবনের অন্য অনেক দিকের পরিচয় দিতে গেলে তা কী করে সম্ভব করা যায় তার নমুনা মম্‌সেনের রোমের ইতিহাসে আছে। রোমান রিপাব্‌লিকের উত্থান ও ধ্বংসের ইতিহাসকে তার উপযোগী নানা পর্বে মম্‌সেন ভাগ করেছেন। প্রতি পর্বের রাষ্ট্রীয়

ইতিহাসের বিবরণ সমাপ্ত করে তার শেষে সে পর্বকালের ধর্ম ও শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে দু-একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। গ্রেকাই-ভ্রাতাদের রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার ও বিপ্লবের চেষ্টা ও তার ব্যর্থতা, মেরিয়াসের বিপ্লব ও ড্রুসাসের সংস্কারের প্রয়াস, প্রাচ্যে মিথ্রাডেটিসের সঙ্গে সংঘর্ষ (মম্‌সেনের মতে ম্যারাথনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যে প্রকাণ্ড সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছিল, বহুদিন স্তিমিত থাকার পর তারই একটা ছোট অধ্যায়; এবং মম্‌সেনের কল্পনায় তাঁর কাল পর্যন্ত এ সংঘর্ষ যেমন হাজার হাজার বছর চলেছে, তেমনি পরবর্তীকালেও হাজার হাজার বছর চলবে), সিনা ও সালার কার্য ও অকার্য— এই নব্বই বছরের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, মম্‌সেন যাকে বলেছেন রোমান ইতিহাসে সবচেয়ে অগৌরবের যুগ, এগারো অধ্যায়ে তার বর্ণনা দিয়ে, মম্‌সেন একটি অধ্যায়ে সে যুগের রোমান রিপাব্‌লিকে নানা জাতি, তাদের অবস্থা ধর্ম ও শিক্ষার বিবরণ দিয়েছেন, এবং আর-একটি অধ্যায়ে সাহিত্য ও শিল্পের অবস্থা বর্ণনা করেছেন; সালার মৃত্যু থেকে রোমান রিপাব্‌লিকের ধ্বংসের উপর জুলিয়াস সিজারের সাম্রাজ্য স্থাপন পর্যন্ত চৌত্রিশ বছরের চিত্তাকর্ষী ও নিশ্বাসরোধী অতিদ্রুত রাষ্ট্রীয় ঘটনা-প্রবাহের

ইতিহাস আবার এগারো অধ্যায়ে বর্ণনা করে, তার শেষে সে যুগের ধর্ম সংস্কৃতি সাহিত্য ও শিল্পের বিবরণ দিয়ে একটি অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন।

এসব অধ্যায়গুলি মম্‌সেনের ইতিহাসের পরিশিষ্ট মাত্র। মূল ইতিহাসের অংশ নয়। তাঁর ইতিহাসের প্যাটার্নের পাশে বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে একটু বুননি-করা। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, সে যুগে রাষ্ট্রীয় ঘটনাই একমাত্র ঘটনা নয়, অন্য ব্যাপারও মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। মম্‌সেন কখনও কল্পনা করেন নি যে তাঁর এইসব বিবরণ সেসব যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের এমন বিবরণ দিয়েছে যে এসব ব্যাপারের প্রতিটির স্বতন্ত্র ইতিহাস লেখার ও পড়ার আর প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয়ের স্বতন্ত্র জ্ঞান যাদের নেই তারা মম্‌সেনের বিবরণ পড়ে কিছুই বুঝতে কি জানতে পারবে না।

মানুষকে অখণ্ড করে দেখাই তাকে সত্য করে দেখা। কিন্তু খণ্ড খণ্ড করে প্রথমে তার পরিচয় না নিলে তাকে অখণ্ড করে দেখা অসম্ভব। 'একং বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং' নয়, সর্বকে জানলেই তবে এককে জানা যাবে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অবশ্যই দেশ ও কালের সম্পূর্ণ পরিচয়

দেয় না। সে সম্পূর্ণ পরিচয়ের উপায় নয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে ফাঁপিয়ে মাল্‌টি-পার্‌পাস ইতিহাসে পরিণত করা। তার উপায় দেশ ও কালের নানা ব্যাপারের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া। তার জন্য স্বতন্ত্র সব ইতিহাসের প্রয়োজন। এসব স্বতন্ত্র ইতিহাস পাঠকের মননের জারক রসে এক হয়ে তবেই দেশ ও কালের অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান দেয়। যে পাঠক সে শ্রম-স্বীকারে প্রস্তুত নন তার জন্য রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে অন্য ইতিহাসের হ্যাণ্ড্‌বুক অবশ্য জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সে হ্যাণ্ড্‌বুকগুলি হ্যাণ্ড্‌বুকই, ইতিহাস নয়।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ যে অন্য সবরকম ইতিহাসের আকর্ষণের চেয়ে বেশি তার কারণ, সে ইতিহাস মানুষের কর্ম-অকর্মের, দুঃখ-সুখের, মহত্ত্ব-হীনতার, দ্বন্দ্ব-মৈত্রীর, জয়-পরাজয়ের বিশিষ্ট কাহিনী। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস, কি ধনতন্ত্রের ক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাসের মতো নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপারের বিবরণ নয়। মানুষের কাছে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের আকর্ষণ মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শের আকর্ষণ। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে বিশেষ যে বলবান, সকল বিধিনিষেধের ব্যাখ্যায় এটি একটি প্রযোজ্য নিয়ম। ইতিহাসেও অ্যাবস্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ 'সামান্য'র চেয়ে কন্‌ক্রিট

'বিশেষ' বলবান। তত্ত্বের মহিমা তখনই হৃদয়ংগম হয় বিশিষ্ট তথ্যের মধ্যে যখন তাকে দেখা যায়।

৬

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একদল ইউরোপীয় ইতিহাস-লেখক বলতে আরম্ভ করলেন যে, ইতিহাস সাহিত্য নয়, ইতিহাস একটা বিজ্ঞান। এবং নিজেদের লেখা ইতিহাসের, পূর্বতনদের সাহিত্য-গন্ধী ইতিহাস থেকে তফাত করার জন্য, নাম দিলেন 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস'— সায়েন্টিফিক হিস্টরি। সে সময় অনেক বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির কাল। কিন্তু এক বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের যা পথ ও নিয়মকানুন, অন্য বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার সে পথে ও সে নিয়মকানুনে চলে না। পদার্থবিজ্ঞানের চলার রীতি ও জীবনবিজ্ঞানের চলার রীতি এক নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি রসায়নবিজ্ঞানের অনুশীলনের রীতি নয়। সকল বিজ্ঞানের সাধারণ কোনো বৈজ্ঞানিক রীতি নেই। যা সকল বিজ্ঞানে সাধারণ সে হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, এবং বিনা প্রমাণে কি অপ্রচুর প্রমাণে কোনো কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ না করা। এবং প্রমাণবিরুদ্ধ হলে চিরপোষিত মত ও চিন্তাধারাকে পরিত্যাগে দ্বিধাহীনতা।

যে ইতিহাস সত্যনিষ্ঠ প্রকৃত ইতিহাস, কল্পনাবিভ্রান্ত নয়, সে ইতিহাসে এসব গুণ অবশ্য থাকবে। অর্থাৎ সে ইতিহাস হবে প্রামাণিক ইতিহাস, বিনা প্রমাণে কিছুকে সত্য বলে গ্রহণ করবে না, কোনো মোহতেই প্রমাণিত সত্যকে গোপন করবে না। কিন্তু মাত্র প্রামাণিক বললে ইতিহাসকে 'বৈজ্ঞানিক' নাম দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞানের যে অসীম প্রেস্টিজ, নামের মহিমায় তার কিছুটা ইতিহাস-বিদ্যায় টানা যায় না। এমন মনোভাব ও চেষ্টা নূতন নয়। পূর্বে যখন দর্শনের প্রেস্টিজ ছিল বড়, এবং বহু বিজ্ঞানের শৈশবকাল, তখন পদার্থবিজ্ঞানের নাম ছিল ন্যাচারাল ফিলজফি। আজ সুনীতিবিদ্যাকে মর‍্যাল ফিলজফি না বলে বলি মর‍্যাল সায়েন্স।

কিন্তু ইতিহাস-রচনাকে যাঁরা বিজ্ঞান-রচনা মনে করেছিলেন, তাঁদের রচিত ইতিহাসে তার ফল ফলেছিল। ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন সাহিত্যের মতো তার সুখপাঠ্য হওয়া দোষের, কারণ তা ভঙ্গী দিয়ে সাধারণ পাঠকের মন ভুলাবার চেষ্টা। ইতিহাস হবে বিজ্ঞানের মতো নিরেট, অর্থাৎ সলিড, এবং তাতে রসের স্পর্শ থাকবে না। সাধারণ পাঠক সে ইতিহাস নাই-বা পড়ল, কারণ সাধারণ পাঠক সচরাচর বিজ্ঞানের পুঁথি পড়ে না।

ফলে সেসব বৈজ্ঞানিক ইতিহাস এখন অসাধারণ পাঠকও পড়ে না।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্বের একটা সুবিধা যে, রচনা-শক্তির তারতম্যে এক ঐতিহাসিক অন্য ঐতিহাসিকের চেয়ে খাটো হয় না। কেননা রচনাশক্তিটাই অবান্তর। কোনো রকমে সত্য তথ্যটা প্রকাশ করতে পারলেই হল। এবং আরও বড় সুবিধা আছে।

ইতিহাস যখন বিজ্ঞান তখন গবেষণায় ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কারের নিয়মগুলি আয়ত্ত করে পরিশ্রম করলেই সকল ঐতিহাসিক সমান মূল্যের ইতিহাস রচনা করতে পারে। ঐতিহাসিক প্রতিভা ব'লে কিছু নেই। আছে নিয়ম মেনে চলা ও পরিশ্রম করা।

হাতে-হাতিয়ারে যারা কোনো বিজ্ঞানের চর্চা করে না, বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর মননধারার খবর জানে না, তাদের অনেকের ধারণা যে, বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালন ক'রে পরিশ্রমনিষ্ঠার ফল। ষোড়শ শতাব্দে যখন ইউরোপে নববিজ্ঞানের উন্মেষকাল, ও তার সাফল্যে সকলে চমৎকৃত, সে সময় ইংলণ্ডের ফ্রান্সিস বেকন এ নববিদ্যার একজন উদ্‌গাতা ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত

গ্রন্থ Advancement of Learning -এ তিনি প্রাচীন-কালের কুসংস্কার-মুক্ত সত্য আবিষ্কারের এই চেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, প্রাচীন মত যদি প্রাচীনদের মত ব'লে গ্রাহ্য করতে হয়, তবে আধুনিকেরাই প্রকৃত প্রাচীন, কারণ প্রাচীনদের চেয়ে আধুনিকদের বয়স অনেক বেশি। ফ্রান্সিস বেকন আর-একখানি পুঁথি লিখেছিলেন, যার নাম Novum Organum, অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের নূতন বিধি-বিধান। এ গ্রন্থে বেকন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের নিয়মগুলির এক তালিকা দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, প্রাকৃতিক ব্যাপারের অনুশীলনে এই নিয়মগুলির প্রয়োগ করলেই সে ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার হবে। এই আশায় ঐ গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরও তালিকা দিয়েছেন, যাতে বিজ্ঞানীরা গবেষণার নিয়মগুলি প্রয়োগ করে সেসব ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে বাঁধাধরা নিয়ম প্রয়োগেই হয় তাতে বেকনের সন্দেহ ছিল না। অর্থাৎ নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করলে যে-কেউ নিউটন কি ডারউইন, আইন-স্টাইন কি প্ল্যাঙ্কের তুল্যমূল্য সত্য আবিষ্কার করতে

পারে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নবনব-উন্মেষশালী বুদ্ধির আবির্ভাব অনাবশ্যক। বিজ্ঞানোৎসাহী বেকনের বিজ্ঞানে যে অন্তর্দৃষ্টি ছিল না তার বড় প্রমাণ যে, ষোড়শ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানে গণিতের স্থান সম্বন্ধে তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদেরও ধারণা বেকনের বিজ্ঞানের ধারণার অনুরূপ— যে-কোনো ইতিহাস-লেখক চেষ্টা করলেই গিবন কি মম্‌সেন হতে পারে!

৭

বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দিন বিগত হয়েছে। এখন যাঁরা সত্যনিষ্ঠ প্রামাণিক ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক বলেন তাঁরা একটা চলতি নাম অভ্যাসবশেই ব্যবহার করেন।

কিন্তু ইতিহাসের বৈজ্ঞানিকত্ব-বিশ্বাসের একটা ফল দূর হয় নি, বেশ টিঁকে আছে। সে হচ্ছে ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্‌বক্তা মনে করা।

বিজ্ঞান ভবিষ্যতের অনেক কথা বলে। জোয়ার-ভাটার সময়, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ, ভবিষ্যতের যে-কোনো দিনে গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান— গুনে বলতে পারে। যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে সেসব নিয়ম দিয়ে গণনা করে বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ বলে। ইতিহাস

যখন বিজ্ঞান তখন ইতিহাস কেন ভবিষ্যতের ঘটনা গুনে বলতে পারবে না ? অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা যেমন অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপারের নিয়ম আবিষ্কার করেছেন, ঐতিহাসিকেরা ঐতিহাসিক ঘটনা পরীক্ষা করে মানুষের সমাজে ঘটনা ঘটার তেমনি সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। এবং সেইসব নিয়ম অনুসরণ করে বর্তমান কোনো মানবীয় ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন।

বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস নাকি বলেছিলেন যে, সৃষ্টির প্রাক্‌কালে পরমাণুপুঞ্জের সংস্থান কেমন ছিল, তাদের গতির দিক ও শক্তির পরিমাণ কী ছিল, তা জানা থাকলে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সব তথ্য তিনি গুনে বলতে পারতেন। হালের বিজ্ঞানীরা অতটা সাহসিক নন। তাঁরা জেনেছেন যে, সৃষ্টির ব্যাপার ও তার মালমসলার প্রকৃতি এরকম গণনায় ধরা দেবার মতো নয়, অনেক বেশি জটিল। মানুষের সমাজের গতি-পরিণতি তার চেয়ে কম জটিল নয়। এ জটিলতার মধ্যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্‌বাণীর চেষ্টা যে কত নিরর্থক, গিবনের ইতিহাসে তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ আছে। গিবন রোম

সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম-রোমান-সাম্রাজ্যের ধ্বংসে ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন, 'and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will illustrate the fall of that mighty empire and explain the probable causes of our actual security,' এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ -ব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। 'The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation'। গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের দু,

বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে তার কোনো সন্দেহ গিবনের মনে হয় নি।[১]

যে ঐতিহাসিকের ভবিষ্যদ্‌বক্তা হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর একবার ভেবে দেখা ভালো যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে ব্যাপক ও সূক্ষ্মতর কি না। কিন্তু ভবিষ্যদ্‌-বাণী উচ্চারণের উৎসাহ সে ভাবনা অনেক ঐতিহাসিককে ভাবতে দেয় না। তার এক নমুনা ইংরেজ লেখক টয়েন্‌বি। বহু খণ্ডে তাঁর বিস্তৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বালোচনা শেষ করে শেষ দু খণ্ডে সোজাসুজি অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণী বলেছেন। এ কালের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর গতিবিধি গোনা যায় না, কিন্তু পরমাণুপুঞ্জের, অর্থাৎ মাস্‌-এর গতি-প্রকৃতি স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল উপায়ে গোনা যায়। টয়েন্‌বি কোনো বিশেষ ব্যাপারের ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন নি, গোটা মানব-সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছেন। সে ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ইউরোপীয় সমাজ ও সভ্যতার ভবিষ্যতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ছবি — যা একজন ইউরোপীয় লেখকের মনে হয়েছে— এসব

১ উদাহরণটি ১৩৩৪ সালের আমার একটি লেখা থেকে গৃহীত। দ্রষ্টব্য, শেষ প্রবন্ধ

ভবিষ্যদ্‌বাণীর জন্ম এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে, ইতিহাসের কোনো শিক্ষা থেকে নয়।

৮

এ কাল পর্যন্ত মানুষের সমাজ ও সভ্যতার যতটুকু ইতিহাস জানা গেছে তাতে সে সমাজ ও সভ্যতার গতির এমন কিছু অলঙ্ঘ্য নিয়ম কি জেনেছি যাতে তার ভবিষ্যৎ গতির কথা কিছু বলা যায়? ইংরেজ ইতিহাস-লেখক এইচ. এ. এল. ফিশার তাঁর 'ইউরোপের ইতিহাস'এর ভূমিকায় লিখেছেন— 'One intellectual excitement has, however, been denied me. Men wiser and more learned than I have discerned in history a plot, a rhythm, a predetermined pattern. These harmonies are concealed from me. I can see only one emergency following upon another as wave follows wave, only one great fact with respect to which, since it is unique, there can be no generalizations, only one safe rule for the historian: that he should

'recognize in the development of human destinies the play of the contingent and the unforeseen. This is not a doctrine of cynicism and despair. The fact of progress is written plain and large on the page of history ; but progress is not a law of nature. The ground gained by one generation may be lost by the next. The thoughts of men may flow into channels which lead to disaster and barbarism.'

কুড়ি বছর পূর্বের লেখা ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নি।

সভ্যতার ভবিষ্যৎ বলা যায়, এ বিশ্বাসের অন্তরে এই স্বীকৃতি লুকিয়ে আছে যে, মানুষের ভবিষ্যৎ ঠিক হয়েই আছে। মানুষের কর্ম অকর্ম নিমিত্ত মাত্র। এ বিশ্বাস কারও মনে হতাশা আনে, কারও মনে উৎসাহ আনে। সমাজের ক্রমপরিণতিতে যে প্রোলিটারিয়েটের ডিক্টেটরশিপ অলঙ্ঘ্য ও অবশ্যম্ভাবী, এ বিশ্বাস কার্ল মার্ক্‌সের মনে উৎসাহ এনেছিল, এবং তিনি অনুচরদের মনে উৎসাহ এনেছিলেন এ বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক সত্য

তার প্রমাণ প্রচার ক'রে। এ বিশ্বাসের মূল কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়, মনের আকাঙ্ক্ষা। মানুষের ও তার সভ্যতার ভবিষ্যৎ যদি প্রথম থেকেই নির্ণীত হয়ে থাকে, এবং তা যদি পূর্বেই জানা যায়, জানা যাবে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার অপরোক্ষ দৃষ্টিতে, ইতিহাস-জ্ঞানের সরু পথে নয়। সুতরাং ইতিহাসে ভবিষ্যদ্‌বাণীর দায়িত্ব অপরোক্ষদৃষ্টি দ্রষ্টাদের ছেড়ে দিয়ে, ঐতিহাসিকদের নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো। মানুষের ইতিহাসের ঋজু কুটিল পথে বিচিত্র গতির যে বিস্ময়, মানুষের মনে সে বিস্ময় জাগাতে পারলেই ঐতিহাসিক ধন্য হবেন।

বৈজ্ঞানিক ইতিহাস

বাঙালী যে নিজের দেশের ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহহীন, স্বদেশের প্রাচীন কাহিনীর জন্য বিদেশীর দ্বারস্থ, কিছুদিন পূর্বেও এইসব কথা তুলিয়া আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিয়া এ বিষয়ে সজ্ঞান করিবার চেষ্টা করিতাম। সেদিন এখন কাটিয়া গিয়াছে; বাংলার গ্রাম খুঁজিয়া, মাটি খুঁড়িয়া বাঙালীই এখন তাম্রশাসন এবং শিলালিপি বাহির করিতেছে, বাঙালী পণ্ডিত তাহার পাঠোদ্ধার ও অর্থোদ্ধার করিতেছে, বাঙালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ তাহার ঐতিহাসিক তথ্য ও মূল্য নির্ণয় করিতেছে। বাঙালী ঐতিহাসিককে বাদ দিয়া এখন আর বাংলার ইতিহাস লেখা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, আশা করা যায় ইতিহাসের মশাল তাহার একটা কোণ রক্তিম করিয়া রাখিবে।

আমাদের এই নবীন ইতিহাস-চর্চায় যাঁরা অগ্রণী তাঁরা একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়াই সকলকে বলিতেছেন। তাঁরা বলেন, তাঁরা যে ইতিহাস অনুসন্ধান ও রচনা করিতেছেন তাহা পুরানো ধরনের পাঁচমিশালো ঢিলাঢালা

ইতিহাস নয়। তাঁদের রচিত ইতিহাস 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাস, এবং তাঁরা যে প্রণালীতে ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করেন তাহা 'বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক প্রণালী'।

ইতিহাসের সম্বন্ধে এই 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'বিজ্ঞানানু-মোদিত' প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলির প্রকৃত অর্থটা কী তাহার আলোচনার সময় হইয়াছে। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়ার, আর সকলরকম বিদ্যার আলোচনাকেই বিজ্ঞান বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা উদ্ভূত হইয়াছে গত শতাব্দীর ইউরোপের নববৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-সমাজে। ইউরোপ এখন আবার এই রোগটাকে দূর করিতে সচেষ্ট। সে দেশ হইতে বিদায় লইয়া ব্যাধিটা যাহাতে আমাদের ঘাড়ে আসিয়া না চাপে সে সম্বন্ধে পূর্বাহ্লেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কেননা এ দেশে যা একবার আসে তা তো আর সহজে বিদায় হয় না, তা শক-হুনই কি আর প্লেগ-ম্যালেরিয়াই কি। বিশেষতঃ দুর্বল শরীরে সকলরকম রোগই প্রবল হইয়া উঠে। আর দেহের রোগের চেয়ে মনের ব্যাধি যে বেশি মারাত্মক তাহাতেও কেহ সন্দেহ করিবেন না।

যে বিদ্যার চর্চাই করি না কেন, তাহাকে বিজ্ঞান

বলিয়া প্রমাণ ও প্রকাশ করিবার ইচ্ছার নিদান হইতেছে, উনবিংশ শতাব্দীতে জড়বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি, আর সেই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে মানুষের জীবনযাত্রার কাজে লাগাইবার চেষ্টার অপূর্ব সাফল্য। প্রথমটিতে পণ্ডিতকে মুগ্ধ করে, কিন্তু জনসাধারণকে অভিভূত করিয়াছে দ্বিতীয়টি। রেল, জাহাজ, ট্রাম, টেলিগ্রাফ, কল, কারখানা, বন্দুক, কামান, ইহাই হইল জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রকট মূর্তি। এমন অবস্থা বেশ কল্পনা করা যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি ঠিক আজকের অবস্থাতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সেগুলিকে ঘর-গৃহস্থালির কাজে লাগাইবার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাপ ও বাষ্পের সকল ধর্মই জানা আছে, কিন্তু রেল স্টীমার তৈরি হয় নাই। তাড়িত ও চুম্বকের নিয়মগুলি অজ্ঞাত নাই, কিন্তু ঘরে ঘরে বিনা তেলে আলো জ্বলে না, বিনা কুলিতে পাখা চলে না। ফ্যারাডে ও ম্যাক্স্‌ওয়েল জন্মিয়াছেন, কিন্তু এডিসনের জন্ম হয় নাই। যদি সত্যই এই ঘটনাটা ঘটিত তাহা হইলে জনসাধারণের কাছে আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের আজ যে আদর ও মর্যাদা আছে তাহার কিছুই থাকিত না। এবং কি ঐতিহাসিক, কি অনৈতিহাসিক

জড়বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে কোনো পণ্ডিতই নিজের শাস্ত্রকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলিয়া প্রচার করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইতেন না। কারণ এই ব্যস্ততার মূলে আছে শাস্ত্রটাকে 'বিজ্ঞান' নাম দিয়া জনসমাজে জড়বিজ্ঞানের প্রাপ্য যে মর্যাদা তাহার কিছু অংশ আকর্ষণ করিবার লোভ। 'নামে যে কিছু যায় আসে না' এ কথাটা কবি বসাইয়াছেন প্রেমোন্মাদিনী কিশোরীর মুখে এবং সেইখানেই ও তত্ত্ব শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে মানব-সমাজের অর্ধেক কাজ নামের জোরেই চলিয়া যাইতেছে, এবং পণ্ডিত-সমাজকেও সে সমাজ হইতে বাদ দিবার কোনো সংগত কারণ দেখা যায় না।

নিজের শাস্ত্রকে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রালোচনার প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া নিজের ও পরের মনকে বুঝাইবার যে ইচ্ছা তাহার আরও একটু গভীরতর কারণ আছে। যখনই কোনো একটা বিদ্যার হঠাৎ অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে তখনই সেই বিদ্যার অনুসৃত প্রণালীটাকে সব তালার একমাত্র চাবি মনে করিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত শাস্ত্রেই সম্ভব অসম্ভব ফললাভের চেষ্টার পরিচয় ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে বার বার দেখা গিয়াছে। দশমিক রাশির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন গ্রীসে যখন

পাটিগণিতের প্রতিষ্ঠা হইল তখন এই রাশিক্রমটির গুণ• আর শক্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহাতে আশ্চর্য হইবারও কারণ নাই। যে গণনা মেধাবী পণ্ডিতেরও দুঃসাধ্য ছিল, ইহার বলে শিক্ষার্থী শিশুও তাহা অনায়াসে সমাধান করিতে লাগিল। এমন ব্যাপারে লোকের মন স্বভাবতই উৎসাহে ও আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা। ফলে এই রাশিক্রমের নিয়ম ও প্রণালীকে সকলরকম বিদ্যায় প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা হইতে লাগিল। এবং অবশেষে পিথাগোরাস ঠিক করিলেন যে, জগৎটা রাশিরই খেলা, রাশিক্রমেরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ। সুতরাং এই রাশিক্রমের হেরফের আরও ভালো করিয়া করিতে পারিলে বিশ্বসংসারের কোনো তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকিবে না। তার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন বীজগণিতের প্রয়োগে জ্যামিতিশাস্ত্রের হঠাৎ আশ্চর্যরকম উন্নতি হইল তখন পণ্ডিতেরা নিঃসংশয়ে স্থির করিলেন যে, জ্যামিতিক প্রণালীই সকল জ্ঞানের একমাত্র প্রণালী। অমন যে ধীর স্থির বৈদান্তিক স্পিনোজা, তিনিও তাঁর দর্শনশাস্ত্রটিকে জ্যামিতির খোলসে আবদ্ধ করিলেন। এখন সেই কঠিন খোলস অতিকষ্টে সরাইয়া তবে তাঁর চিন্তার রস গ্রহণ করিতে হয়। ইহার

পর আসিল নিউটনের আবিষ্কৃত গণিতের পালা। নিউটন যখন তাঁর গণিতের সাহায্যে গ্রহ-উপগ্রহের সমস্ত গতিবিধির ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন তখন চোখের সম্মুখ হইতে যেন চিরকালের অজ্ঞানের পর্দাটা সরিয়া গেল। জাগতিক ব্যাপারের মূলসূত্রটা যে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এবং কোনো রকমে এই গণিতটা প্রয়োগ করিতে পারিলেই যে সকল বিদ্যাই জ্যোতিষের মতো ধ্রুব হইয়া উঠিবে, সকলেরই এই স্থির বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসের জের এখনও চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও গত শতাব্দীর প্রথমে যখন তাড়িত ও চুম্বকের অনেক ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িল তখন আবার জ্ঞানসমুদ্রে একটা ছোটখাটো ঢেউ উঠিয়াছিল। তাড়িত ও চুম্বকের ধর্ম ও নিয়ম জগতের সব জিনিসেই আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মনের বল যে তাড়িতেরই শক্তি ইহা তো একরকম স্বতঃসিদ্ধই বোঝা গেল, এবং স্ত্রী-পুরুষ, জল-স্থল, ঠাণ্ডা-গরম ইত্যাদি যেখানেই জোড়া বর্তমান সেইখানেই যে চুম্বকের দুই প্রান্তের সম্বন্ধ ও ধর্ম বিদ্যমান, এ বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কোনো সন্দেহ ছিল না। জর্মান পণ্ডিত শেলিং এই চুম্বক বেচারির উপর একটা ভারী

রকমের গোটা দর্শনশাস্ত্রই চাপাইয়া দিলেন। বিজ্ঞ পাঠকের এরকম ছোট বড় আরও অনেক দৃষ্টান্ত মনে পড়িবে ; এবং যদিও খুব ভয়ে ভয়েই বলিতেছি, আমাদের দেশে যে ত্রিগুণতত্ত্বের চাবি দিয়া সংসারের সকল রহস্যের দুয়ার খুলিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও আলোচ্য বিষয়ের আর-একটা উদাহরণ।

সুতরাং আজ যে সকল শাস্ত্রের আচার্যেরাই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই, এমন ঘটনা পূর্বেও অনেকবার ঘটিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকবার ঘটিবে। বর্তমান যুগের শরীর ও মন বিজ্ঞানের বলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এক দিকে দেখিতেছি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলির জ্ঞানের পথে অপূর্ব সফলতা, অন্য দিকে দেখিতেছি কর্মের জগতে তাদের বিস্ময়কর পরিণতি। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরের বিষয় লইয়া যাঁদের কারবার তাঁরা যে একবার ঐ বিজ্ঞানের পথটা ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিবেন তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। যখন দেখা যাইবে যে ও পথটা যতই প্রশস্ত হোক ওটা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেরই গন্তব্য পথ, অন্য বিদ্যাগুলির নয়, তখনই মোড় ফিরিবার কথা মনে আসিবে। যাহাকে ঘাটে যাইতে হইবে সে

যদি হাটের পথের সোরগোল দেখিয়া সেই পথেই চলিতে শুরু করে তবে ঘাটে পৌঁছিতে বিলম্ব ছাড়া আর কোনো ফল হয় না।

আমাদের নব্য-ইতিহাসের আচার্যেরা যে এইসব ভাবিয়া চিন্তিয়া, এইসব গভীর অগভীর কারণে চালিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কেননা আমাদের দেশে এ কথাটা ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের মতো একেবারে বিলাত হইতে তৈরি মালই আসিয়াছে ; এবং ইংরেজি পুঁথির মাড়োয়ারি মহাজন ইহাকে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইতিহাস অনুসন্ধানের সম্পর্কে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী কথাটার মূলে কোনো বস্তু আছে কি না সে আলোচনা আমাদের দেশে নিষ্প্রয়োজন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়।

২

অবান্তর কথা বাদ দিয়া মূল কথা বলিতে গেলে কেবল এইমাত্রই বলিতে হয় যে, বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ, প্রকৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানের কাজের প্রণালী ও প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও ধর্মের আবিষ্কার করা। কিন্তু এই কাজ কিছু বিজ্ঞানবিদ্যারই একচেটে নয়। পৃথিবীতে যেদিন হইতে

মানুষের জন্ম হইয়াছে, মানুষ যখন বনে জঙ্গলে গিরি-গুহায় বাস করিত, সেদিন হইতে কেবলমাত্র দেহরক্ষার জন্যই মানুষকে অল্পবিস্তর এই কাজে হাত দিতে হইয়াছে। মানুষ যেদিন আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছে সেদিন সে প্রকৃতির এক মহাশক্তি আবিষ্কার ও আয়ত্ত করিয়াছে। যেদিন কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছে সেদিন তো প্রকৃতির বহু বিভাগের কাজের প্রণালী বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। কথা এই যে, জীবনযাত্রাটা চালাইবার জন্য মানুষকে তাহার চারি পার্শ্বের প্রকৃতির যে সাধারণ-জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, বিজ্ঞানবিদ্যালব্ধ জ্ঞানের সহিত তাহার কোনো জাতিগত প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষত্ব তাহার ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়। সাধারণভাবে ঘরকন্নার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় প্রকৃতির বিশালতার তুলনায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিরাট প্রকৃতির সমস্ত অংশের পরিচয় করা। সুদূর নক্ষত্রের গঠন-উপাদান হইতে আরম্ভ করিয়া অনুবীক্ষণদৃশ্য কীটাণুর জীবন-ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই ইহার জ্ঞাতব্য। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যে সাধারণ-জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা মূলস্পর্শী না হইলেও চলে; বিজ্ঞানবিদ্যার লক্ষ্য

একবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের মূলের দিকে। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসে ভূয়োদর্শনের ফলে, এই যে জ্ঞান ইহা সাধারণ-জ্ঞান। নির্দিষ্ট পথে নিরূপিত সময়ে সূর্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেমন করিয়া ঋতু-পরিবর্তন হয় সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। উপযুক্ত আহার পাইলে শরীর পুষ্ট ও বলশালী হয়, আর আহার-অভাবে শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হয়, এ জ্ঞান সাধারণ-জ্ঞান। জীবদেহ কেমন করিয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে এবং পরিপক্ক অন্নরস কেমন করিয়া জীবশরীরের ক্ষয় পূরণ ও উপাদান গঠন করে সে জ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। সাংসারিক কাজের জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন তাহা স্থূল হইলেও চলে, তাহাতে চুলচেরা হিসাবের প্রয়োজন নাই, বরং সে হিসাব করিতে গেলে সুবিধা না হইয়া অনেক সময়ে কাজ অচল হইয়া উঠিবারই কথা; কিন্তু বিজ্ঞান চায় সকল জিনিসেরই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব। একটা চারাগাছ যখন বাড়িতে থাকে তখন প্রতিদিনই কিছু কিছু বাড়ে ইহা সকলেই জানি, ইহা সাধারণ-জ্ঞান। গাছটা প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বাড়িতেছে তাহা জানা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান। প্রচলিত ঘড়ির সময়ের বিভাগ সাংসারিক কাজের জন্য যথেষ্ট; আচার্য জগদীশচন্দ্রকে

কতকগুলি পরীক্ষার জন্য এক সেকেণ্ড সময়কে হাজার ভাগে ভাগ করা যায় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। সাংসারিক প্রয়োজনের পরিমাপ-যন্ত্র মুদির দাঁড়িপাল্লা, বিজ্ঞানবিদ্যার চাই 'কেমিক্যাল ব্যালান্স'।

যেমন জ্ঞানে তেমনি জ্ঞানের প্রণালীতে বৈজ্ঞানিকে ও সাধারণে কোনো ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল ভেদ নাই। যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পথে ও কর্মেন্দ্রিয়ের চেষ্টায় আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি সেই ইন্দ্রিয়গুলিই বিজ্ঞানেরও ভরসা। যে ন্যায় ও যুক্তি আমরা প্রতিদিনকার সাংসারিক কাজে ব্যবহার করি সেই ন্যায় ও যুক্তির প্রণালীই বিজ্ঞানেরও একমাত্র সম্বল। এমনকি আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য আমরা জগৎ-সংসারটার যে রূপ কল্পনা করি এবং যেরকম ভাগে তাকে ভাগ করি মোটামুটি তাহার উপরেই ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান তার বৈজ্ঞানিক জগৎ নির্মাণের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি ফরাসী দার্শনিক বার্গ্‌সোঁ এমন চমৎকারভাবে বুঝাইয়াছেন যে তাহার পর আর কাহারও বাগাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞানের প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রণালী মূলে এক হইলেও, বিজ্ঞান যে ব্যাপক গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞান চায় তাহার জন্য তাকে নানারকম কৌশল

আবিষ্কার করিতে হয়। বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি, গণিত, পরীক্ষা এইগুলিই সেই কৌশল। ইহার কোনোটির লক্ষ্য অতিদূর বা অতিসূক্ষ্মকে ইন্দ্রিয়ের গোচরে আনা, কোনোটির উদ্দেশ্য এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে তফাত করিয়া অন্য অবস্থায় তার গুণাগুণ পরীক্ষা করা, কোনোটির চেষ্টা যে কাজের নিয়মটা এমনি ভালো বোঝা যায় না তাকে গণিতের কলে ফেলিয়া আয়ত্ত করা— এই কৌশলগুলিতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিশেষত্ব এবং ইহারাই বিজ্ঞানের উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু এই বিশেষত্ব অতি বিশিষ্ট রকমের বিশেষত্ব। অর্থাৎ যে কাজের জন্য যে কৌশলটির দরকার সেই কাজ ছাড়া আর অন্য কাজে তাহাকে প্রয়োগ করা বড় চলে না। কারণ এই কৌশলের আকার ও ভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হয় জ্ঞানের বিষয়লক্ষ্যের দ্বারা। কাজেই এক বিজ্ঞানের কৌশলকে অন্য বিজ্ঞানে বড় কাজে লাগানো চলে না, এবং একই বিজ্ঞানের এক বিভাগে যে কৌশল চলে অন্য বিভাগে তাহা অনেক সময় অচল। গতি-বিজ্ঞানে যে গণিত দিগ্‌বিজয়ী, রসায়ন-বিজ্ঞান তাকে কাজে লাগাইতে পারে না। রসায়নের যে বিশ্লেষণ-প্রণালী, তাড়িত-বিজ্ঞানে তাহার প্রভাব নাই।

কাজেই ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রণালীর যাহা বিশেষত্ব তাহাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাহিরে নেওয়া চলে না। এই বিশেষত্বের বেশির ভাগই প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র, বিজ্ঞান-বিশেষেই বিশেষভাবে আবদ্ধ। আর যাহা সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই সাধারণ তাহা মোটেই বিজ্ঞানে অনন্যসাধারণ নয়। তাহা হইতেছে সাধারণ যুক্তি ও জ্ঞানের প্রণালী, এ বিষয়ে বিজ্ঞানে ও সাধারণ-জ্ঞানে কোনো ভেদ নাই। এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া কোনো লাভ নাই। কেননা এখানে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয়েরই আসন এক জায়গায়।

সুতরাং ঐতিহাসিক যখন বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা বলেন তখন প্রথমেই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার কথাটার অর্থ, যুক্তিসংগত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল এইটুকু বলিলে লোকের মনোযোগও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয় না এবং বিষয়টাকেও সেরকম মর্যাদা দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের নামের মন্ত্র উচ্চারণ করিলে এই দুই কাজই অনেক সময় কী যেন একটা শক্তির বলে অচিন্তিত উপায়ে সিদ্ধ হইয়া যায়।

দুই-একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। শ্রীযুক্ত রাখালদাস-

বাবুর 'বাঙ্গালার ইতিহাস' আমাদের দেশের নবীন ইতিহাস-চর্চার একটি প্রথম ও প্রধান ফল। সেই পুঁথি হইতেই দৃষ্টান্ত তুলিব।

দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে মহীপালদেবের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে লেখা আছে যে, মহীপালদেব বাহুবলে সকল বিপক্ষ দল সংগ্রামে নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন। ঐ তাম্রশাসনেই তাঁহার পিতা বিগ্রহপালদেবের বিষয় উল্লিখিত আছে যে তিনি সূর্য হইতে বিমল কলাময় চন্দ্রের মতো উদিত হইয়া ভুবনের তাপ বিদূরিত করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার রণহস্তীগণ প্রচুরপয়ঃ পূর্বদেশ হইতে মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া হিমালয়ের অধিত্যকায় উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'মহীপালদেবের পিতার কোনোরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য হইতে চন্দ্ররূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য "কলাময়"ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা ও গজেন্দ্রগণ

(আশ্রয়স্থানাভাবে) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংযুক্ত হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয়লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন-সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।' এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাখালবাবু টীকা করিয়াছেন, 'মৈত্রেয়মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।'[১] এ কোন্ বিজ্ঞান? মৈত্রেয়-মহাশয়ের ব্যাখ্যা সুযুক্তিসংগত এবং রসজ্ঞতারও পরিচায়ক বটে এবং তিনিও সেইভাবেই কথাটা লিখিয়াছেন। ইহার মধ্যে বিজ্ঞান বেচারাকে টানিয়া আনা কেন?

কল্হণ রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের গৌড়ের রাজাকে হত্যার এবং রাজ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য গৌড়পতির ভৃত্যগণের 'পরিহাস কেশব' -নামক দেবতার মন্দির অবরোধ ও তাহাদের বীরত্বের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। 'গৌড় রাজমালা'য় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে এই কাহিনী সম্ভবতঃ অমূলক নয়, কেননা কল্হণ প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই

---

১ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ ২১১

এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এবং মূলে সত্য না থাকিলে কাশ্মীরে গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনীর কোনো জনশ্রুতি থাকিবার কথা নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালবাবু লিখিয়াছেন, 'শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কল্‌হণ মিশ্র কর্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কল্‌হণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কল্‌হণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ-বিজয়-কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোনো দ্বিধা বোধ করেন নাই। একই গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে এক অংশ অমূলক এবং দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস-রচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে।' তার পর রাখালবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, রাজতরঙ্গিনীর ইংরাজি-অনুবাদ-কর্তা স্টাইন-সাহেব এ ঘটনাটা 'সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন।'[২] স্টাইন-সাহেবের মত সত্য হইতে পারে এবং রমাপ্রসাদবাবুর ভুল হইতে পারে, কিন্তু কোনো

২ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ ১০৭

জনশ্রুতির মূলে সত্য আছে কি না তাহা স্থির করিবার কোনো বাঁধা 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী' নাই। চারি দিক দেখিয়া এ কথাটা বিচার করিতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো ইহা অল্পবিস্তর মতামতের বিষয়ই থাকিয়া যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রণালীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব কিছু নাই। সচরাচর দশজনে একটা কথার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে যেরকমভাবে বিচার করে এও ঠিক সেই রকমের বিচার। তার পর সম্ভবতঃ একটু অবান্তর হইলেও না বলিয়া থাকা যায় না যে রাখালবাবু তাঁহার 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী'র যে একটি সূত্রের কথা এখানে বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই অচল। সে সূত্র আর কোনো বিচার না করিয়াই মানিয়া চলিতে হইলে, কি বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক, সমস্ত ইতিহাস রচনাই বন্ধ করিতে হয়। 'বিজ্ঞানসম্মত' হইলেও প্রকৃতপক্ষে ও সূত্রটা কেহ মানিয়া চলে না, এবং প্রয়োজন হইলে রাখালবাবুও মানেন না। তিব্বতের তারানাথ গোপালদেব গৌড়বাসীর রাজা হইবার অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'প্রতিদিন এক-একজন রাজা নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে

গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।' এই রাজপত্নীর গল্প সম্বন্ধে রাখালবাবু লিখিয়াছেন, 'তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্বাচনের কথা আছে তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্বে ভূতপূর্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল।'[৩] সুতরাং 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস' যে একই গ্রন্থের একই বিষয়ে এক অংশ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে কেবল তাই নয়, একই ছত্রের এক অংশকে উপকথা এবং অন্য অংশকে সত্য বলিয়াও সাব্যস্ত করে। এইরূপে রাখালবাবু তাঁহার··· গ্রন্থে বহুবার বহু স্থলে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা তুলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কথার অর্থ, সাধারণ সুযুক্তি-সংগত প্রণালী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত কথা এই যে, যে জাতীয় সত্য ইতিহাসের লক্ষ্য, তাহা দৈনন্দিন জীবনে সর্বসাধারণ যাহা লইয়া কারবার

৩ বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ ১৫০

করে সেইরকম সত্য। সুতরাং সে সত্য আবিষ্কারের প্রণালীও সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষের প্রতিদিনকার কাজের যুক্তির প্রণালী। সে প্রণালীতে কোনো বৈজ্ঞানিক বিশেষত্বের আশা করা দুরাশা।

দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর কথা পুনঃপুনঃ শুনিয়া মনে হয়, বুঝি পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে যাহা মানিয়া চলিলেই ঐতিহাসিক সত্যে পৌঁছনো যায়। এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নাই। ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কিন্তু সত্যে পৌঁছিবার বাঁধা রাস্তা যেমন বিজ্ঞানেরও নাই, তেমনি ইতিহাসেরও নাই। এইরূপ পাকা রাস্তা থাকিলে কি বিজ্ঞানে কি ইতিহাসে প্রতিভাবান ও প্রতিভাহীনের এক দর হইত। কিন্তু প্রতিভাবান ছাড়া তো কেহ ইতিহাস গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ মজুরের দালান-গাঁথা নয় যে ইটের উপরই ইঁট বসাইয়া গেলেই হইল। যে উপাদান লইয়া সাধারণ লোকে কিছুই করিতে পারে না, ঐতিহাসিক প্রতিভা যাঁর আছে তিনি তাহা হইতেই সত্যের কল্পনা করিতে পারেন এবং অনুসন্ধানে সেই কল্পনা সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। সবরকম বড় সত্যে পৌঁছিবারই এই পথ। তার পর এও ভুলিলে চলিবে না যে, ঐতিহাসিকের আসল

কাজ ধ্বংস করা নয়, গড়া। সত্য অনুসন্ধানের একটা অসম্ভব আদর্শ খাড়া করিয়া কিছুই বিশ্বাস করি না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেই যে ঐতিহাসিক সত্য আসিয়া হাতে ধরা দিবে, এমনও বোধ হয় না।

হয়তো উত্তরে শুনিব যে, বিজ্ঞানের যেটা লীলাভূমি সেই সাগরপারে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের নিয়মকানুন কাটাছাঁটা হইয়া ঠিক হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইতিহাসের যে একটা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। এই আইনকানুন যে ঠিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তাহা হইল সমুদ্রপারের ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের 'বিজ্ঞান বিজ্ঞান' খেলা। এ খেলার প্রবৃত্তি কেন হয় এ প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং লর্ড অ্যাক্টন বা সীলীর বচন তুলিয়া কোনো লাভ নাই।

মানবজাতির মুক্তির জন্য ভগবান তথাগত যে চারটি মহাসত্যের প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একটি এই যে, সকল জিনিসই নিজের লক্ষণে বিশিষ্ট— 'সর্বং সলক্ষণং স্বলক্ষণং'। এক নাম দিয়া ভিন্ন বস্তুকে এক কোটায় ফেলা যায়, কিন্তু তাহাতে বিভিন্ন জিনিস এক হয় না। বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে যেসকল

বিদ্যা আছে তাহাদের মুক্তির জন্য ভগবান বুদ্ধের বাণীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

ইতিহাস

প্রাচীন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস নেই এই ঘটনায় আমরা কখনও লজ্জা পাই, কখনও গর্ব করি। আর সব সভ্যজাতির লোকেরা তাদের জয়-পরাজয় কাজ-অকাজের নানা কাহিনী লিখে গেছে, প্রাচীন হিন্দু তা করে নি। এই স্বাতন্ত্র্যকে, মনের অবস্থা-মতো, আধ্যাত্মিকতার প্রমাণও বলা চলে, আবার ঐতিহাসিক বোধের অভাবও বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসীর কথা যাই হোক, নবীন ভারতবাসীর ইতিহাসকে উপেক্ষা করার জো নেই। আধ্যাত্মিকতার দাবি তাদের পূর্বপুরুষদের ছেড়ে দিতে হয়েছে, সুতরাং আধুনিকতার দাবি আর ছাড়া চলে না, এবং ঐতিহাসিক বোধ হচ্ছে আধুনিকতার একটা প্রধান লক্ষণ। নবীন ভারতবাসীর প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টার মধ্যে প্রাচীনের উপর ঔৎসুক্য যতটা আছে, আধুনিকতার দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার লজ্জা তার চেয়ে কম নেই।

লজ্জার খাতিরে ইতিহাস-প্রীতি আমাদের অস্বাভাবিক অবস্থার আর পাঁচটা ফলের মতোই একটা অদ্ভুত ফল। প্রাচীন যুগের কথা শোনার মানুষের যে স্বাভাবিক

আগ্রহ, আর ভবিষ্যৎ-মানুষকে নিজের কথা শোনাবার যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এই দুয়ে মিলে প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টি। আজকের দিনের যেসব ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনা, অখ্যাত মানুষের অকিঞ্চিৎকর কাহিনী, মানুষের চোখ ও মন স্বভাবতই এড়িয়ে যায়, হাজার বছর আগেকার ঠিক এমনি সব ব্যাপারের কথা শুনতে মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। আবার হাজার বছর পরের মানুষের কাছে এইসব তুচ্ছ ঘটনা ও নগণ্য কাহিনীই কবির কথায়—'সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।'

অতীতের আলো-ছায়ার খেলায় মানুষের মনে যে বিস্ময়রসের সৃষ্টি করে ইতিহাসের তাই প্রধান আকর্ষণ। আর ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে, অক্ষরে লিখে অনাগত কালকে নিজের কথা জানাবার মানুষের যেসব উপায়, তারাই ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য না করে শুধু বর্তমানে আবদ্ধ মানুষের যে ক্রিয়াকলাপ ও জীবনখাতা, তার প্রত্নখণ্ড দিয়ে ইতিহাসকে পরীক্ষা করা চলে, সৃষ্টি করা চলে না। মানুষ প্রাচীন ইতিহাস জানতে পারে, প্রাচীন কালের লোকেরা কোনো-না-কোনো উপায়ে সে ইতিহাস জানিয়ে গেছে বলে।

মানুষ অতীতের মধ্যে নিজেকে দেখতে চায়, ভবিষ্যৎকে

নিজের স্পর্শ দিতে চায়। ইতিহাস এই আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তির উপায়। কিন্তু যারা ইতিহাস লেখে ও যারা ইতিহাস পড়ে তারা এ কথা মানতে রাজি নয় যে, ইতিহাসের কাজ মানুষ সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল মেটানো। তাদের মতে এতে ইতিহাসকে অতি খাটো ও খেলো করা হয়। যে জিনিস মানুষের হাতে, হাতিয়ারের যে কাজ তার সাহায্য না করে, তার আবার মূল্য কী? সুতরাং তারা প্রমাণ করে যে ইতিহাস মানুষের মহা উপদেষ্টা। অতীতের আলো দিয়ে ইতিহাস বর্তমানের পথ দেখায়। 'বর্তমানের ঘটনা বা উদ্যোগ-অনুষ্ঠান অতীতের ঘটনা-প্রবাহের সহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যরূপে বদ্ধ, মানবের সমাজগত জীবনের অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের প্রত্যক্ষ অংশ; সুতরাং বর্তমানের উদ্যোগ-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে হইলে অতীতের ইতিহাসের ধারা দেখিয়া শুনিয়া লওয়া, অর্থাৎ প্রচলিত কথায় যাহাকে বলে দেশ কাল পাত্র তাহা সাবধানে হিসাব করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া কর্মী মাত্রেরই কর্তব্য, নতুবা অনেক ভ্রম-প্রমাদ ঘটিতে পারে।'[১]

---

১ রমাপ্রসাদ চন্দ, "ভূত ও বর্তমান", 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪।

বর্তমান যদি 'অতীত' কারণের কার্য হয়, অখণ্ড ঘটনা-প্রবাহের একটা অংশ মাত্র হয়, তবে ঐ প্রবাহের বেগে তা নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে ভেসে যাবেই। ইতিহাস সে দিকটা পূর্ব থেকে বলে দিতে পারে এ যদি সত্যও হয়, তবুও সে জ্ঞানের ফলে দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটার কথা নয়। স্রোতের টানে কোথায় যাচ্ছি তা জানা থাকলেই সে গতিকে কিছু নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। আর কর্মীরা যে দেশ-কাল-পাত্রের হিসাব ক'রে কর্মে সফলতা লাভ করে তা বর্তমান দেশ, বর্তমান কাল ও বর্তমান পাত্র। সে বর্তমানের অতীত ইতিহাস অবশ্য আছে, কিন্তু কর্মীর যা সাবধানে হিসাব করতে হয় তা ঐ ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ফলে যে বর্তমান গড়ে উঠেছে সেই বর্তমান। যাকে পাথর কাটতে হয়, পাথরের গড়ন জানা তার দরকার। কিন্তু সে গড়নের যে ইতিহাস ভূতত্ত্ব থেকে জানা যায় তাতে তার প্রয়োজন হয় না। আর ভূতত্ত্বের পণ্ডিত যে পাথর কাটার কাজে অন্যের চেয়ে সহজে ওস্তাদি লাভ করতে পারে এ কথা অবশ্য কেউ বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর বড় কর্মীরা সকলেই নিজের প্রতিভার আলোতে বর্তমানকে চিনে নিয়েছে, ইতিহাসের আলোতে নয়।

প্রাচীন ইতিহাসের যে বর্তমানকে চেনাবার শক্তি কত কম ঐতিহাসিক গিবন তার একটা 'ক্লাসিক' উদাহরণ রেখে গেছেন।

এডোয়ার্ড গিবনের তুলি রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের বারো শো বছরের যে ইতিহাস এঁকেছে, তার মতো প্রকাণ্ড ও জটিল ঐতিহাসিক চিত্র আর কোনো ঐতিহাসিক কখনও আঁকে নি। এই বহু জন, বহু জাতি ও বহু ঘটনা -সংঘাতের বিচিত্র কাহিনীর বর্ণনায় গিবন মানব-সমাজের স্থিতি গতি ও ধ্বংসের যে উদার গভীর ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন সকল ঐতিহাসিকের তা চিরদিন বিস্ময় জাগাবে। গিবন রোমান সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাঁর সমসাময়িক ইউরোপীয় রাজ্যগুলির দিকে তাকিয়েছেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য -ধ্বংসের ইতিহাস শেষ করে গিবন লিখছেন: '...and we may inquire, with anxious curiosity, whether Europe is still threatened with a repetition of those calamities which formerly oppressed the aims and institutions of Rome. Perhaps the same reflections will illustrate the fall of that mighty empire, and

explain the probable causes of our actual security.' এবং এই পরীক্ষার ফলে গিবনের মনে হয়েছে যে, তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ -ব্যবস্থা মোটামুটি দৃঢ় ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে: 'The abuses of tyranny are restrained by the mutual influence of fear and shame; republics have acquired order and stability; monarchies have imbibed the principle of freedom, or at least of moderation.' গিবন তাঁর ইতিহাস লিখে শেষ করেন ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের দু বছর পূর্বে। তাঁর সমসাময়িক ইউরোপের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে যে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির পাথর-গলা আরম্ভ হয়েছে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ গিবনের মনে হয় নি। রোম-সাম্রাজ্য-ধ্বংসের, ইতিহাস তাঁর বর্ত্তমানের দৃষ্টিকে কিছুমাত্র তীক্ষ্ণতর করে নি। যে ঐতিহাসিক ইতিহাস-জ্ঞানের জোরে বর্তমানকে উপদেশ দিতে সাহসী করেন তাঁর একবার ভেবে দেখা ভালো যে, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি গিবনের চেয়ে সূক্ষ্মতর কি না!

২

বর্তমান যে অতীতের ইতিহাসকে কাজে লাগায় না তা নয়। বর্তমানের কাজে মানুষ প্রাচীন ইতিহাস অনেক সময়েই ডেকে আনে; কিন্তু সে উপদেশ লাভের জন্য নয়, অতীতকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ অস্ত্রের মতো ব্যবহারের জন্য। ইতিহাসে যা এর অনুকূল লোকে তাকে প্রচার করে; যা প্রতিকূল তার দিকে চোখ বুজে থাকে। ইংলণ্ডের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পলিটিশ্যনেরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির তুলে রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্ব ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে ইতিহাস যে সব সময়েই সত্য ইতিহাস, তার ব্যাখ্যা যে সকল সময়েই নির্ভুল ব্যাখ্যা হত—এ কথা এখন কোনো ঐতিহাসিক স্বীকার করবে না। কিন্তু ঐ ইতিহাসই ছিল সেদিনের কাজের ইতিহাস। বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ইতিহাসে সেদিনকার কাজ চলত না, কাজ অচল হত; এর উদাহরণের জন্য সাগর-পারে যাবার প্রয়োজনও নেই। বর্তমান হিন্দুসমাজের যাঁরা সংস্কার চান আজ তাঁরা হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস থেকে নজির আনছেন, আর যাঁরা সে সংস্কারকে বন্ধ রাখতে চান তাঁরাও ঐ ইতিহাস থেকেই নজির তুলছেন। এর কোনো ইতিহাসই সম্পূর্ণ

সত্য নয় বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। গোটা প্রাচীন ইতিহাসকে, কোনো কাজে লাগানো যায় না, তা থেকে অংশবিশেষ বেছে নিতে হয়। কে কোন্ অংশ বেছে নেবে তা ঐতিহাসিক সত্যের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার গরজের উপর।

৩

যাকে 'ঐতিহাসিক সত্য' বলা হয়— যা থেকে মানুষ তার বর্তমান গতিবিধি সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ পায় বলে অনেকের বিশ্বাস— তার স্বরূপটি কী? যা ঘটে গেছে সেই ঘটনার তথ্য নির্ণয় 'ঐতিহাসিক সত্য' নয়, প্রত্নতত্ত্ব মাত্র। ইতিহাস থেকে যারা উপদেশ চায় তারা ধরে নেয়, সে ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্যের মধ্যে তত্ত্ব লুকিয়ে রয়েছে, যাকে ঘটনার বিশেষত্ব থেকে মুক্ত করে অবিশেষ-সাধারণ সত্য বলে ব্যবহার করা চলে। ঐতিহাসিকের সবচেয়ে বড় কাজ, প্রত্নতত্ত্বের তথ্য থেকে এই ঐতিহাসিক সত্য বা তত্ত্বের আবিষ্কার করা। প্রতি ইতিহাসের মধ্যেই কোনো-না-কোনো তত্ত্ব আছে। যথার্থ ঐতিহাসিকের চোখে সে তত্ত্ব ধরা পড়ে।

সমসাময়িক ঘটনা, অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতৃদের সম্বন্ধে

মানুষের ধারণা ও মত এক নয়। এদের মূল্য ও ভালোমন্দ -বিচারে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমান থেকে অতীতের কোঠায় গেলেই যে এদের মূল্য সবার চোখে এক দেখাবে, এদের বিচারে মতভেদের অবসর থাকবে না, এমন বিশ্বাসের কারণ কী? বর্তমানের ঘটনা নিয়ে অনেক তর্ক যে ভবিষ্যতের ঘটনা দিয়ে মীমাংসা হয় সে কথা সত্য, কিন্তু ঘটনা থেকে যে তত্ত্বোপদেশের আশা করা হয় তার তর্কের অবসান নেই। কারণ একই ইতিহাস সকলের চোখে ও সকল সময়ের চোখে একরূপ নয়। মানুষের মনের আশা ও আকাঙ্ক্ষা, ভাব ও চিন্তার পরিবর্তনের সঙ্গে ইতিহাসেরও মূর্তিপরিবর্তন হয়। মানুষের যাত্রাপথের প্রতি বাঁক থেকে পিছনের ইতিহাসের চেহারা বিভিন্ন দেখায়— যেমন পাহাড়-পথের যাত্রী পথের নানা স্থান থেকে সমতলভূমির নানা চেহারা দেখে। এর কোন্ চেহারা সত্য, কোন্ চেহারা মিথ্যা? প্রতি যুগের মানুষ ইতিহাসকে নূতন করে লিখছে ও নূতন করে লিখবে। ইতিহাসের এই নূতন নূতন রূপের কোনো রূপই মিথ্যা নয়, কারণ ও সব রূপই ব্যাবহারিক অর্থাৎ আপেক্ষিক। ইতিহাসের কোনো পারমার্থিক রূপ নেই। ইতিহাসের ঘটনানির্ণয়ের শেষ থাকতে পারে, কিন্তু তার ব্যাখ্যার

কখনও শেষ হবে না।

ইতিহাসকে যারা উপদেশের খনি মনে করে তারা তার এই রূপ-পরিবর্তনের কথাটা ভুলে থাকে। অথচ ইতিহাস সম্বন্ধে এর চেয়ে সহজ সত্য আর কী আছে। কোন্ বড় ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা ব্যক্তির বিচারে ঐতিহাসিকেরা একমত? বেশি উদাহরণের প্রয়োজন নেই, এক ফরাসী বিপ্লব ও তার কর্মীদের যেসব ইতিহাস লেখা হয়েছে ও হচ্ছে, তার কথা মনে করলেই যথেষ্ট হবে। ইতিহাসের ঘটনা ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদাহরণ নয়। ও তত্ত্ব মানুষ নিজের মনে মনে গড়ে নেয়, অর্থাৎ যার যেমন মন সে তেমনি তত্ত্ব ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে পায়। ইতিহাসের যে উপদেশ তা ইতিহাস থেকে মানুষের মনে আসে না, মানুষ নিজের মন থেকে ইতিহাসে তা আরোপ করে।

৪

মানব-সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনে। মানুষের আশা ও ভয়, বর্তমানের চাপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা, তার জীবনের পথ কেটে চলেছে। ইতিহাসের কাজ জীবনের এই বিচিত্র লীলাকে দর্শন করা,

মনন করা, নিদিধ্যাসন করা। যেসব তত্ত্ব দিয়ে মানুষ জীবনকে ব্যাখ্যা করতে চায়, জীবন তাদের চেয়ে অনেক জটিল। তাই কোনো ঐতিহাসিক তত্ত্বই ইতিহাসের চরম-ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এবং এক আংশিক ব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঐতিহাসিকেরা অন্য এক আংশিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। ইতিহাস-জ্ঞানের চরম লাভ, মানব-সমাজের গতি ও পরিণতির এই রহস্যলীলার সঙ্গে পরিচয়। যে ইতিহাস পাঠকের মনে এই রহস্যের বোধকে জাগিয়ে তোলে সেই ইতিহাসই যথার্থ ইতিহাস। বাকি সব হয় গল্প নয় প্রপাগাণ্ডা। ইতিহাস জীবন-লীলার কাব্য। যার চোখে আর্টিস্টের উদার দৃষ্টি নেই, আজকের দিনের ভালোমন্দ-রাগবিরাগের উপরে উঠে মানুষের জীবনধারাকে যে দেখতে জানে না, তার ঐতিহাসিক হবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। আর ইতিহাসের প্রতি পাতায় যারা উপদেশ খোঁজে তাদের বিশ্বাস, ইতিহাস হচ্ছে কথামালারই জ্ঞাতি-ভাই।

৫

ইতিহাস কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা করে। তার অর্থ এ নয় যে, মানুষ সমাজে ও

জীবনে নূতন কিছু ঘটাতে পারে না ; তার বর্তমান তার অতীতের কার্য মাত্র, আর তার ভবিষ্যৎ তার বর্তমানের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা যখন ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চান তখন এমনি একটা ধারণা তাঁদের ভাবনার মধ্যে গুপ্ত থাকে। সাদা চোখে অবশ্য আমরা সবাই দেখি যে, মানুষ তার জীবনে নিত্য এমন-সব ঘটনা ঘটাচ্ছে যা তার অতীত ও বর্তমান থেকে কেউ কখনও অনুমান করতে পারত না। ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে তার ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়। কিন্তু তত্ত্বের খাতিরে সত্যকে উপেক্ষা না করলে সহজেই বোঝা যায় যে, কার্যকারণের ব্যাখ্যা পেলেই নূতনের অভিনবত্ব দূর হয় না। মানুষের ইতিহাসে যেগুলি তার গৌরবের অধ্যায় তার অনেক ঘটনাকে মানুষ ঘটিয়েছে অতীতকে অতিক্রম করে, বর্তমানকে নাকচ করে—ইতিহাসকে ধরে থেকে নয়।

বাঙালী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের যে প্রবন্ধ থেকে পূর্বে বচন তুলেছি তাতে তিনি 'কার্যক্ষেত্রে ঐতিহাসিক হিসাব-কিতাবের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য' যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন তার প্রথম উদাহরণ, 'অস্পৃশ্যতা বর্জন'. নিয়ে পরীক্ষা করা

যাক। চন্দমহাশয় 'চৈতন্যচরিতামৃত' থেকে কয়েকটি ঘটনা তুলে প্রমাণ করেছেন যে, 'অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলে উভয় পক্ষই পাপভাগী হইবে, এইপ্রকার বিশ্বাস অস্পৃশ্যতার মূল।' এবং তিনি বলেন, 'এইপ্রকার বিশ্বাস হিন্দু সাধারণের মধ্যে এখন খুব দুর্বল হইলেও, ইহার বীজ যে এখনও হিন্দুর মনের ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এমন কথা বলা যায় না।' এর শেষ সত্যটি ঐতিহাসিক সত্য নয়, বর্তমান কালের কথা। যার চোখ আছে সে, চৈতন্যচরিতামৃত পড়া না থাকলেও, বর্তমান হিন্দুসমাজ দেখে এ তথ্য জানতে পারবে। যার সে চোখ নেই চৈতন্যচরিতামৃত তার এ কাজে কোনো সাহায্য করবে না। তার পর চন্দমহাশয় বলেছেন, 'ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষাও অস্পৃশ্যতার প্রবলতর সহায় জাত্যভিমান। য়ুরোপ এবং আমেরিকা প্রত্যাগত অনেকের হিন্দু-জাতিতে উঠিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে বুঝিতে পারা যায় জাত্যভিমান কি প্রবল পদার্থ।' চন্দমহাশয় প্রশ্ন করেছেন, 'এই প্রবর্ধমান ব্যাধির আরোগ্যের উপায় কি ?' এবং উত্তর দিয়েছেন, 'আমার মনে হয়, এই ব্যাধির আরোগ্যের প্রধান উপায়, যথাবিধি সামাজিক রীতি-নীতির ইতিহাস অনুশীলন এবং জনসাধারণকে ঐতিহাসিক

এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে এইসকল বিষয়ের বিচার করিতে শিক্ষা দেওয়া।'

ঐতিহাসিক অনুশীলন ও বৈজ্ঞানিক বিচার যে কী উপায়ে অপচীয়মান ধর্মবিশ্বাস ও প্রবর্ধমান জাত্যভিমানের ধ্বংস করবে চন্দমহাশয় তা কিছু বলেন নি। ইতিহাস অনুশীলনে হয়তো পাওয়া যাবে যে, মানুষের সমাজে বড়-ছোটর বোধ সভ্যতার সঙ্গে একবয়সী। আর ঐ ভেদকে অবলম্বন করেই সভ্যতার ইমারত গাঁথা আরম্ভ হয়েছিল। এ বোধ বা জাত্যভিমান যা হোক কিছু-একটাকে অবলম্বন করে চিরদিন মানুষের সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর 'যথাবিধি' ঐতিহাসিক শিক্ষাটি কী? এ ভেদকে দূর করলে সভ্যতার মন্দির ভেঙে পড়বে, না সভ্যতার মন্দির এতটা গড়ে উঠেছে যে ও 'স্কাফোল্‌ডিং' এখন সরিয়ে নেওয়া চলে? এর কোনো অনুমানকেই কি অনৈতিহাসিক বলা যায়? আর যদি বলাও যায় তবে ইতিহাসের তর্কে হেরে এক মতের লোক অন্য মতের চালে চলবে এ মনে করা মানব-চরিত্রের সুক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় নয়। লেনিন ও মুসোলিনির দ্বন্দ্ব যে ঐতিহাসিক সম্মিলনীতে মীমাংসা হবে এ স্বপ্ন ঐতিহাসিকেও কখনও দেখে না। আর রমাপ্রসাদ চন্দ

মহাশয় কি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন যে 'অ্যান্থ্রপলজি' থেকে মানুষ সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা পাবে ?

চন্দমহাশয় চৈতন্যচরিতামৃতের যেসব ঘটনা তুলেছেন তার প্রধান কথা, শ্রীচৈতন্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ধর্ম-সংস্কারকে নিজে বিন্দুমাত্র মানতেন না।

'মোরে না ছুঁইহ প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডুরস গায়॥
বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল॥'

এ যে 'ঐতিহাসিক অনুশীলন' বা 'বৈজ্ঞানিক বিচার' -এর ফল নয় তা চন্দমহাশয়কেও স্বীকার করতে হবে। চৈতন্যের যেসব ভক্তেরা তাঁর পাণ্ডিত্যের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরাও তাঁদের তালিকায় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নাম উল্লেখ করেন নি। মহাপ্রভু 'কণ্ডুক্লেদ গায়' অস্পৃশ্যকে আলিঙ্গন দিয়েছিলেন ইতিহাস অনুশীলন করে নয়, সমস্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে।

সমাজে নূতন কিছু আনতে হলে শ্রীচৈতন্যের প্রয়োজন হয়। ইতিহাস-অনুসন্ধান-সমিতি দিয়ে সে কাজ চলে না। মানুষ জীবনের টানে এগিয়ে চলে, সৃষ্টির প্রেরণায় নূতন সৃষ্টি করে। ইতিহাস জীবনের এই সৃষ্টিলীলার

দর্শক। এ লীলার কলকৌশল বুঝলেই সৃষ্টির ক্ষমতা আসে না, যেমন কাব্য বুঝলেই কবি হওয়া যায় না। তা যদি হত তবে মম্‌সেন ইতিহাসের পুঁথি না লিখে একটা রাজ্যস্থাপন করতেন, আর ব্র্যাড্‌লির হাতে আর-একখানা হ্যাম্‌লেট লেখা হত।

—

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা-৯

২·৫০ টাকা